সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুন ২০১৮

শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব ও ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধন

২৩ মে ২০১৮
পবিত্র রমজান মাসে আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়

১৮ মে ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের জাতীয় পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সম্মেলন উদ্বোধন

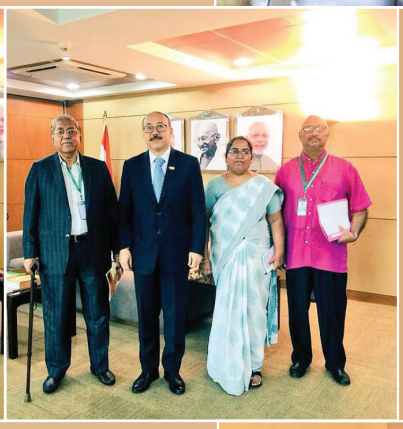

২১ মে ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে শ্রী সমীর নারায়ণ, ভিএলএনজি ইন্ডিয়ার শ্রী ময়ঙ্ক গর্গ এবং ট্যুর অপারেটরস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান তৌফিক উদ্দীন আহমেদের সাক্ষাৎ

২০ মে ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশে তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাক্ষাৎ

০১

০২

০১. ২২ মে ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে তাঁর কার্যকাল সমাপন উপলক্ষে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন... শুভ কামনা এক্সিলেন্সি!

০২. ৩০ মে ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ইউএনএইচসিআর-এর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি ও কোঅর্ডিনেটর মি. জেমস লিঞ্চ ও ব্যাংকক, থাইল্যান্ডের আঞ্চলিক প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ০৬ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৫ | জুন ২০১৮

High Chommission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

কু ড়ি আ ট্ট ম

নাটক ও ভক্তির অনুপম সংমিশ্রণ

পৃষ্ঠা: ৩০

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা ও যশোর আইভিএসিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না ০৪
ঢাকা ও চট্টগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তির চেক বিতরণ ০৫
ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বক্তৃতা ০৭

প্রচ্ছদ রচনা — শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব ও ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধন ১০

শিক্ষা বৃত্তি — মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ স্কিম ১২

স্মরণ — ছদ্মবেশী রাজকুমার ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
অবিনাশী বেলাল ভাই ॥ খোরশেদ বাহার ১৭
দ্বিতীয়রহিত বেলাল চৌধুরী ॥ সুশান্ত মজুমদার ২০

কবিতা — রবিউল হুসাইন ॥ দুলাল সরকার ॥ শামীমা চৌধুরী হাসান হাফিজ ২৪
হালিম আজাদ ॥ মাসুদ মুস্তাফিজ ২৫

প্রবন্ধ — বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা ॥ সন্তোষ ঢালী ২৬

সংস্কৃতি — কুড়িআট্টম ॥ অঞ্জনা রাজন ৩০

ছোটগল্প — মতিজানের মেয়ে ॥ রফিকুর রশীদ ৩৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি — একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তপন চক্রবর্তী ৩৬

ভ্রমণ — শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ॥ মোহাম্মেদ দিদারুল আলম ৩৯

রাজ্য পরিচিতি — কেরালা ৪৩

শেষ পাতা — সাগরময় ঘোষ ৪৮

পৃষ্ঠা ১০

শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব ও ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধন

২৫ মে ২০১৮ ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনের জন্য অন্যরকম একটি দিন। এদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব আর বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে দু’দিনের সরকারি সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন সকালে কলকাতা পৌঁছন। প্রথমে তিন নেতা যোগ দেন বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে। শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বভারতীর আচার্য। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আয়োজিত সমাবর্তন উৎসবে যোগদানের পর শেখ হাসিনা, নরেন্দ্র মোদী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যান বিশ্বভারতীর পূর্বপল্লিতে বাংলাদেশের অর্থে নির্মিত ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ০২ ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

এত ভাল পত্রিকা, তাও কিনা বিনামূল্যে!

আমি খুনলা বিশ্ববিদ্যালরের মাস্টার্স-এর শেষ বর্ষের ছাত্রী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপরাজিতা হল'-এর আবাসিক শিক্ষার্থী। দীর্ঘ চার বছর এখানে আছি। পড়াশুনোর মাঝেও পত্র-পত্রিকা-বই পড়ার সুযোগ করে নিই। খুলনার পুরনো বই-এর দোকান থেকে পেলে কলকাতার পুরনো সাহিত্য পত্রিকা শারদীয় সংখ্যাগুলো কম পয়সায় কিনে এনে পড়ি। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ খুবই ভাল লাগে। আমার এক রুমমেট একদিন হলে একটা *ভারত বিচিত্রা* নিয়ে এল। গ্রামের বাড়ির পাশের একজন গ্রাহক আছেন কেউ। তার কাছ থেকে এনেছিল। আমি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করি। সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং তা বিনামূল্যে গ্রাহকদের দেওয়া হয়– জেনে খুব ভাল লাগল এবং আমি খুবই উৎসাহী ও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। পত্রিকাটি (ভারত বিচিত্রা) পড়তে গিয়ে একটি গ্রাহক তালিকার কুপন পেলাম। রুমমেটকে না জানিয়েই কুপনটি পূরণ করে ফেললাম। হয়তো সে নিজে পূরণ করবে বলে এনেছিল। আমি তার কাছে ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইলাম। তাই *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক তালিকাভুক্তির জন্য আমার গ্রামের বাড়ির ঠিকানা লিখে পাঠালাম। আমাকে নিরাশ করবেন না। এত ভাল পত্রিকা ভারতীয় হাই কমিশন প্রকাশ করে তা জানতাম না। তাও কিনা বিনামূল্যে! ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা– যেমন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, রাজ্য পরিচিতি, একগুচ্ছ কবিতা, বিজ্ঞানের নানা দিকসহ দু'একজন খ্যাতিমান ব্যক্তির পরিচিতি খুবই ভাল লাগল। চলচ্চিত্রের ওপর লেখা পড়তে চাই। ভারতের বহু খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন– ধারাবাহিকভাবে তাঁদের ওপর লেখা পড়তে চাই। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্রের ফটোকপি এইসাথে পাঠালাম। এক সময় হল ছাড়তে হবে– তাই স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বাড়ির ঠিকানা গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমার ছোট বোনও আমার মত সাহিত্য পত্র-পত্রিকা পড়তে আগ্রহী। সে বটিয়াঘাটা কলেজের ইন্টারমেডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, আবার লেখালিখিও করে। তাই পরিশেষে আবারও *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক করে নিয়মিত পাঠানোর অনুরোধ করছি। আমাদের দু'বোনকে নিরাশ করবেন না।

চৈতালী মল্লিক
গ্রাম: হোগল বুনিয়া
ডাকঘর: বটিয়াঘাটা, খুলনা-৯২৬০

দারুণ সুন্দর সংখ্যা

জীবন-প্রদীপ নিভু নিভু স্তরে নেমেছে– এ সময় নিজেকে খারাপ লোকে ছাড়া ভাবতে পারছি না। আমার ব্যবহারে আমি আপনার মত তরুণ বন্ধুকেও শেষ পর্যন্ত হারিয়েছি। আপনি কেমন আছেন? আপনাকে কোনওমতেই ভুলতে পারছি না।

ভারত বিচিত্রা ফেব্রুয়ারি সংখ্যা সম্প্রতি হাতে পেলাম। দারুণ সুন্দর সংখ্যা। এর মধ্যে নারায়ণ সাহার 'দেবা' গল্পটি পড়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এমন গল্প! 'এ যে বৃহৎ অর্থে বাংলাদেশ-ভারতবর্ষের মানুষের জীবনকথা' এমন প্রতীতি অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হল। কল্যাণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের দু'দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মত এই হীনবল হয়তো আবার দৃঢ়তর হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের শুষ্ক হাসি ঠোঁট আঁকড়ে ধরে। হায় কল্যাণী, তোমার দেবা হবার স্বপ্ন– স্বপ্নই থেকে গেল!

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়ের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ওপর লেখাটি সর্বার্থে একটি সার্থক রচনা। এমন মহাপুরুষ সম্পর্কে জানতাম কিন্তু এমন সূক্ষ্মতর স্তরে তা উপনীত হতে পারেনি। ধন্যবাদ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার লেখা-পড়া-জানা সার্থক– সার্থক আপনার লেখনী।

হিমাদ্রিশেখর সরকারের উপেক্ষিতা উর্মিলা রচনাটি পড়ে এই বৃদ্ধবয়সেও চোখের জল সংবরণ করতে পারা গেল না। এমন সুন্দরী, এমন মহীয়সী নারীর জীবনগাথা এ-রকম! হায় রামায়ণ, তোমার ভেতরে সীতার সঙ্গে আরেক অভাগীর চরিত্র-চিত্রণ বড়ই বেদনা-বিধুর!

প্রিয় সম্পাদক, আমাকে কি কিছু লিখতে একটা আদেশ অর্পণ করবেন? আপনি না বললে আমি কিছু লিখব না– লিখব না– লিখব না।

ইজাজ হোসেন
দামোদর পূর্বপাড়া, ফুলতলা, খুলনা

• প্রিয় অধ্যাপক, আপনি যে আমাকে ভালবাসেন, সে আপনারই মহত্ত্ব। আমি সামান্য সম্পাদক, বেলাল ভাইয়ের পদাঙ্কই শুধু অনুসরণ করে চলেছি। আপনাকে কিছু একটা লিখতে আমি কি আদেশ অর্পণ করতে পারি? শুধু বলি, যে-কোন বিষয়ে আপনার লিখতে মন চায়, আপনি লিখে আমাদের বাধিত করুন। আপনি লিখুন– আপনি লিখুন– আপনি লিখুন।
– সম্পাদক

জয় হোক *ভারত বিচিত্রার*

বিশ্বব্যাপী মানব সম্প্রদায় সর্বত্র আপন অস্তিত্ব রক্ষায় জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এসবই মানুষের সতত সইতে হয় জীবন সংগ্রামে। সকল বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকাও মানুষের স্বভাব।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধনে সুদীর্ঘ পথ সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করে ৪৬ বৎসরের দীপ্তিমান এক প্রকাশনা *ভারত বিচিত্রার* প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। প্রায় ৩০ বছর আগে থেকেই পড়ছি অনিয়মিতভাবে। বাংলাদেশ ও ভারতের লেখকের লেখাগুলো এক নিমেষেই পড়ে শেষ করা যায়। যেমন একটি সংখ্যার কথা বলা যায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সংখ্যাটি। এখানে অফিসিয়াল কিছু সংবাদের পাশাপাশি বেশ কিছু লেখা খুবই সুখপাঠ্য। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি, চিত্ররূপময় কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশ', 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত', 'উপেক্ষিতা উর্মিলা', আনা-রবি-র প্রেমবিষয়ক 'যেমন করে গাইছে আকাশ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলো শুধু নিছক সাহিত্য নয়, ইতিহাসও বটে যা যুগে যুগে চিরন্তন মানুষকে প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। এ সংখ্যায় নান্দনিক একটি ছোটগল্প ছাপা হয়েছে নারায়ণ সাহার 'দেবা'। কলকাতার কবি-লেখকদের লেখার সংখ্যা একটু বাড়ানো যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। রাজ্য পরিচিতিতে 'উত্তরাখণ্ড'কে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা থেকে বাংলাভাষী যে কেউ ঐ রাজ্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা ও তথ্য পেয়ে যাবেন। সংখ্যাটিতে বেশকিছু কবিতা ছাপা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি

২০১৮ সংখ্যা হিসেবে ৫২'র ভাষা আন্দোলন নিয়ে আরও ২/১টি লেখা থাকলে ভাল হত। পরিচ্ছন্ন অঙ্গসজ্জা এবং মানসম্পন্ন লেখা নির্বাচনে সম্পাদকের পরিশ্রম ও সম্পাদকীয় মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। আর এ কারণেই *ভারত বিচিত্রার* প্রতি ভালবাসা কাজ করে সবসময়। সেই ভালবাসা ও ভালবাসার খাতিরেই লিখতে চাই, নিয়মিত পেতে চাই, প্রতিটি সংখ্যাই। জয় হোক *ভারত বিচিত্রার*।

আমিরুল বাসার কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার
সম্পাদক, সাম্প্রতিক
১৬০/এ কাকরাইল ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন-০১৭৬২২৯১৪৪৭
ই-মেইল: samprotikbd@gmail.com

আনন্দময় পথ চলার ২০ বছর

তোমাকে প্রথম হাতে তুলে নিয়ে পড়ার দৃশ্যটা এখনও অমলিন প্রিয় *ভারত বিচিত্রা*। ১৯৯৭ সালের ফাল্গুনের এক মন মাতাল করা দুপুরে স্কুল লাইব্রেরির কর্নারে ফেলে রাখা পুরনো বই ও ছেঁড়া পত্রিকার মধ্যে তোমাকে আবিষ্কার করেছিলাম। পুরনো কয়েকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি দেখে ভাল লেগে গেল। কয়েকটি কবিতা তখনই পড়ে ফেললাম। পুরনো যতগুলো সংখ্যা পড়ে ছিল, আমি সংগ্রহ করলাম। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ছিল সংখ্যাগুলো। আমার গল্প, কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে *ভারত বিচিত্রার* ভূমিকা সর্বাধিক।

অনেক দেরি করে নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যাটি হাতে পেলাম। আর অতিক্রম করলাম পত্রিকার সঙ্গে আনন্দময় পথ চলার ২০ বছর। এক সময় স্বপ্ন দেখতাম অন্যদের মত আমার ঠিকানায়ও *ভারত বিচিত্রা* আসবে। অজ প্রায় ২ বছর হল, সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখনও প্রতি মাসে অপেক্ষায় থাকি কবে পাব সুখপাখি নামক *ভারত বিচিত্রা* পত্রিকাটি। কখনও কখনও এ অপেক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। তবুও নিরাশ হই না, আশায় থাকি...

শেখর বালা
গ্রাম: বেলেডাঙ্গা
ডাক: জোয়ারিয়া
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

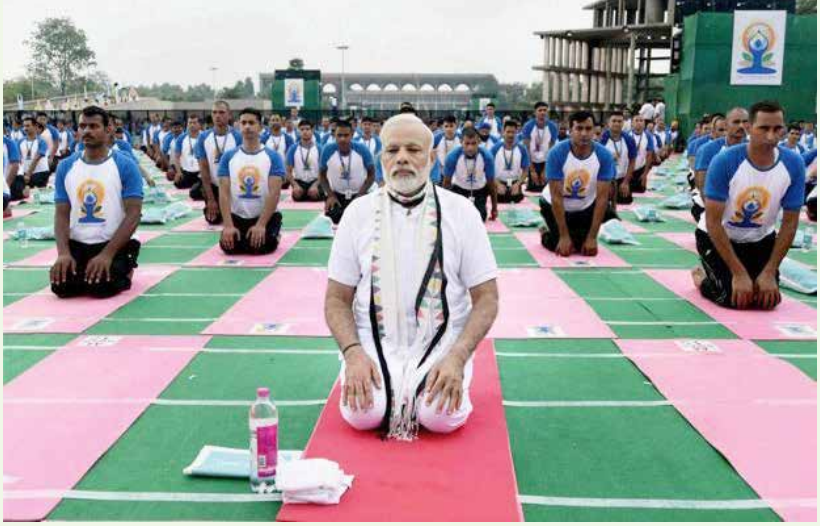

সম্পাদকীয়

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগানুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যান্য বছরের মত এবারও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশাল যোগানুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

যোগানুশীলন একটি প্রাচীন জীবনাচরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেছিলেন, শুধু পার্থিব চিকিৎসা ব্যক্তির শরীরের ব্যাধির কিছু উপশম করলেও তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপার্থিব কিছু প্রয়োজন। যোগ হচ্ছে পার্থিব-অপার্থিবের সেই আশ্চর্য সম্মিলন যার মধ্য দিয়ে মানুষ শরীরে ও মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে খ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়ায় ও প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদিকযুগে যোগের বহুল প্রচার ছিল এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে যোগ ও ধ্যান। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন জাপান তিব্বত ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায়। যোগ এখন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত একটি চর্চিতব্য বিষয়। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই বরং এটি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না বরং এতে মন বন্ধনহীন উন্মুক্ত হয়। দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায় ফলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্ম ১৮৯৩ সালের ২৯ জুন। সে-হিসেবে একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষে পদার্পণ করলেন প্রশান্তচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের প্রখ্যাত প্রফেসর, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ও 'সংখ্যা' সাময়িকীর প্রকাশক-সম্পাদক, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মের একশ পঁচিশতম বছরে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা ও যশোর আইভিএসিতে অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন নেই

বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসাপ্রাপ্তি আরও বাধাহীন, সুষ্ঠু ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ভারতীয় হাই কমিশনের চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, পর্যটক ভিসার জন্য আবেদনকারীদের অগ্রিম অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন নেই এবং তারা ২০ মে ২০১৮ থেকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল আইভিএসি-তে সরাসরি আবেদন জমা দিতে পারবেন। উক্ত আইভিএসিগুলোতে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে।

পর্যটক ভিসা ছাড়া চিকিৎসা, ব্যবসা, সম্মেলন এবং অন্যান্য ভিসা আবেদন আগের মতই সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া প্রবীণ নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরাসরি অন্য কাউন্টারে আবেদনপত্র জমাদান অব্যাহত থাকবে।

নতুন এই ব্যবস্থা চট্টগ্রামে ৯ জুলাই ২০১৭, রাজশাহী ও রংপুরে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এবং ১০ অক্টোবর ২০১৭ মিরপুর ১০, ঢাকা আইভিএসি-তে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া একটি উদ্যোগের অংশ যা একইভাবে সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল আইভিএসি-তে চালু করা হচ্ছে।

এদিকে খুলনা ও যশোরের বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসাপ্রাপ্তি আরও বাধাহীন, সুষ্ঠু ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ভারতীয় হাই কমিশনের চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, পর্যটক ভিসার জন্য আবেদনকারীদের অগ্রিম অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন নেই এবং তারা ১১ জুন ২০১৮ থেকে খুলনা ও যশোর আইভিএসি-তে সরাসরি আবেদন জমা দিতে পারবেন। উক্ত আইভিএসিগুলোতে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে।

পর্যটক ভিসা ছাড়া চিকিৎসা, ব্যবসা, সম্মেলন এবং অন্যান্য ভিসা আবেদন আগের মতই সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া প্রবীণ নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরাসরি অন্য কাউন্টারে আবেদনপত্র জমাদান অব্যাহত থাকবে।

নতুন এ ব্যবস্থা চট্টগ্রামে ৯ জুলাই ২০১৭, রাজশাহী ও রংপুরে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, মিরপুর রোড, ঢাকায় ১০ অক্টোবর ২০১৭ এবং ২০ মে ২০১৮ সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল আইভিএসি-তে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া উদ্যোগের অংশ হিসেবে একইভাবে খুলনা ও যশোর আইভিএসি-তে এটি চালু করা হল।

ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি সহজতর করা এবং ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এ পদক্ষেপের লক্ষ্য।

সতর্কীকরণ

বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ivacbdhelpline@gmail.com-এ ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে এক বা একাধিক স্বার্থান্বেষী মহল ভিসা আবেদনকারীদের কাছে এ মর্মে মেইল পাঠাচ্ছে যে, তাদের আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই এবং এ জন্য অর্থ দিতে হবে।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উপরোক্ত ই-মেইল আইডিটি ভারতীয় হাই কমিশনের নয়। নিচে ভারতীয় হাই কমিশন এবং ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের ই-মেইল আইডিসমূহ দেওয়া হল:

1. visahelp@hcidhaka.gov.in
2. info@ivacbd.com
3. visahelp@ivacbd.com

● নিজস্ব প্রতিবেদন

২৬ মে ২০১৮ পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী সাধন চক্রবর্তী এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করেন

ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

৩ মে ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে ভারতীয় হাই কমিশন মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এ চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. কামরুল ইসলাম এমপি ।

ভারত সরকার ২০০৬ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের আওতায় সরকার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা অনুযায়ী ভারত সরকারের নতুন স্কলারশিপ স্কিমে আগামী ৫ বছরে মোট ১০,০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে এবং এ জন্য ব্যয় হবে ৩৫ কোটি টাকা।

এবছর বৃত্তি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২ হাজারের বেশি মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তির চেক বিতরণের উপরের দুটো ছবি ঢাকার, নিচেরটি চট্টগ্রামের

চট্টগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তি বিতরণ

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন চট্টগ্রাম ক্লাবে মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তির চেক বিতরণের অনুরূপ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২৬ মে ২০১৮ চট্টগ্রাম ক্লাবে আয়োজিত এ চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী অনিন্দ্য ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদলের ভারত সফর

৮ মে ২০১৮ বাংলাদেশ থেকে সংবাদমাধ্যমের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির নর্থ ব্লকে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যম মালিকদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শ্রী এম জে আকবরের সঙ্গেও দক্ষিণ ব্লকে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

পরে প্রতিনিধিদলটি ভারতের কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) পরিদর্শন করেন। সিআইআই পরিদর্শনকালে ভারতের বিদ্যুৎ ও বাণিজ্য সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী দীপক অমিতাভ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সহযোগিতামূলক বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। তাঁরা ব্যবসা ও বাণিজ্য খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনাবিষয়ক বিভিন্ন ধারণা নিয়েও আলোচনা করেন।

এরপর বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলটিকে মুম্বইয়ের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস সদর দফতর পরিদর্শন করেন। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস বা টিসিএস হচ্ছে ভারতের সর্ববৃহৎ ও প্রথম আইটি কোম্পানি যারা ১০ হাজার মার্কিন ডলার বাজার পুঁজি অর্জন করেছে। টিসিএস-এর কর্পোরেটবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী অমিত নিবাসকর বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দলটিকে টাটা ও টিসিএস-এর ব্যবসায় পদ্ধতি ও এর বৈশ্বিক কর্পোরেট কৌশল বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

প্রতিনিধিদলের সঙ্গে টিসিএস-এর আইটি ও আইটিবিষয়ক খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দলটিকে সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ায় স্বাগত জানানো হয়। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় সেশনে আলোচনায় অংশ নেন এসইবিআই-এর সদস্য শ্রীমতী মাধবী পুরী বুচ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিকিউরিটিস মার্কেটের পরিচালক ড. শ্রীমতী এম থেনমোজি। তাঁদের আলোচনায় অর্থনৈতিক বাজারের নিয়ম ও উন্নয়ন এবং প্রতিটি বিনিয়োগকারীর সচেতনতা শিক্ষা ও সুরক্ষা স্থান পায়। এসময় এসইবিআই-এর প্রধান মহাব্যবস্থাপক শ্রী এন হরিহরণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দলটিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শ্রী বিক্রম লিমেয়ে স্বাগত জানান। প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় স্টক এক্সচেঞ্জের সর্ববৃহৎ উদ্ভাবন, স্বচ্ছতা উদ্যোগ ও সমন্বিত সংহতির বিভিন্ন দিক, প্রযুক্তি নবায়ন, স্টেট অফ আর্ট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের বৈশ্বিক সেবার মান বিষয়ে অবগত করা হয়।

প্রতিনিধি দলটি মুম্বইয়ে রিপাবলিক টিভির কার্যালয়ও পরিদর্শন করেন। তাঁরা টেলিভিশন কেন্দ্রটির স্টুডিও, বার্তাকক্ষসহ চ্যানেল অফিস ঘুরে দেখেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চ্যানেল প্রধান শ্রী অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য যৌথ গণমাধ্যম উদ্যোগগ্রহণসহ দ্বিপক্ষীয় মিডিয়া সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতের মানবিক সহায়তা

৫ মে ২০১৮ ভারতীয় নৌবাহিনির জাহাজ *ঐরাবত* মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষের চাহিদা পূরণে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বিশখাপত্তনম থেকে যাত্রা করে ৮ মে চট্টগ্রাম এসে পৌছয়।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার মানবিক সাহায্য প্রদানের প্রথম পর্যায়ে ৯৮১ মেট্রিক টন ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করে। এসব ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল প্রায় তিন লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাল, ডাল, চিনি, লবণ, রান্নার তেল, চা, নুডলস, বিস্কুট, মশারি ইত্যাদি।

এটি ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণকে দেওয়া উপহার। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ বন্ধন রক্ষার্থে ভারত সবসময় বাংলাদেশের যে কোন সংকটে নির্দ্বিধায় ও তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছে।

৯ মে ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের পক্ষে আইএনএস ঐরাবতে আসা ৩৭৩ মেট্রিক টন মানবিক সহায়তা (শুটকি মাছ, শিশুখাদ্য, গুড়ো দুধ, গাম বুট, রেইনকোট) বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার কাছে হস্তান্তর করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শ্রী শ্রিংলা

আইজিসিসি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সাংস্কৃতিক বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে

৯ মে ২০১৮ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূরসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট অতিথি ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হাই কমিশনারের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ: ঢাকাস্থ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এই আট বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেগুলো দুই দেশের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে।

অভিন্ন সংস্কৃতির কারণে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক অনন্য। উভয় দেশের মানুষ তাদের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গান ও কবিতা, বাউল ও লোকসংগীত, ধ্রুপদী পারফর্মিং আর্ট এবং ভিজ্যুয়াল আর্টসমূহ উভয় দেশেই উৎসাহ এবং আনন্দের সাথে চর্চা করা হয়। ভারত ও বাংলাদেশের বহুসংখ্যক শিল্পী প্রতিবছর দুই দেশে সফর করেন যা দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে গভীর করে।

আমাদের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকার ২০১০ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স (আইসিসিআর) এর অধীনে ঢাকায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১০ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর থেকেই কেন্দ্রটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রসারে জড়িত রয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হল ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা। হিন্দি, যোগ, হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত, তবলা, মণিপুরী ও কত্থক নৃত্য এবং চিত্রকলাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে কেন্দ্রে। এই কোর্সসমূহ খুবই জনপ্রিয় এবং আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে, প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী আমাদের কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। গত পাঁচ বছরে দশ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী শিক্ষার্থী আইজিসিসিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ভারতীয় ও বাংলাদেশী চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শন, চলচ্চিত্র উৎসব, শিল্প প্রদর্শনী, বইয়ের উদ্বোধনী, বক্তৃতা, আলোচনা সভা এবং যোগবিষয়ক কর্মশালা, হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত, ভারতীয় নৃত্য ও চিত্রকলাসহ সমগ্র সাংস্কৃতিক বিষয়ে কেন্দ্রের কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের ৯০তম বার্ষিকী আমাদের দুই দেশের যৌথ আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীও যৌথভাবে উদ্‌যাপন করেছি। কেন্দ্রটি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় ও বাংলাদেশী শিল্পীদের অংশগ্রহণে দু'দেশে নিয়মিত অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক বিনিময় করেছে। গত তিন বছরে আইজিসিসি ২১৪টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যার মধ্যে ৬০টি ছিল ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত অনুষ্ঠান।

আইজিসিসি আয়োজিত কিছু স্মরণযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– ভারতীয় নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্করের বক্তৃতা; বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী প্রমিতা মলিকের পরিবেশনা; আইসিসিআর-এর আয়োজনে রুহানি সিস্টার্স, শেহনাই দল ও সুফি বাওরার দলের বাংলাদেশ সফর; নয়াদিল্লিতে আইসিসিআর আয়োজিত দ্বিতীয় ভারতীয় ভক্তি উৎসবে লালনগীতি শিল্পী ফরিদা পারভীনের অংশগ্রহণ; আইসিসিআর লোকসংগীত উৎসবে কিরণচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে লোকশিল্পীদলের অংশগ্রহণ; ভারতে আইসিসিআর আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও 'সুরের ধারা' দলের সংগীত পরিবেশনা; আইজিসিসিতে কাজী নজরুল ইসলামের ভারতীয় নাতনী অনিন্দিতা কাজী ও বাংলাদেশী নাতনী খিলখিল কাজী পরিবেশিত অনুষ্ঠান।

আইজিসিসি নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। এছাড়া, প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী আব্দুল আলিম ও আব্বাসউদ্দিনের জন্মদিন উপলক্ষে শিল্পীদ্বয়ের সন্তানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকার সহযোগিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি যেমন: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের পরিবেশনায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সহযোগিতায় দুটি অনুষ্ঠান– বাংলাদেশের ৮ শিশুশিল্পীর পরিবেশনায় নৃত্যানুষ্ঠান এবং ২০১৭ সালে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন; ভারতের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের বক্তৃতা; সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শান্তিনিকেতন থেকে আসা সব্যসাচী সেরখেল-এর সেতার বাদন, নয়াদিল্লির সারথি চ্যাটার্জির উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং কলকাতার পরিমল চক্রবর্তীর তবলা বাদন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের আয়োজনে আইজিসিসিতে অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠান। বাংলাদেশী শিল্পীদের অসাধারণ কিছু পরিবেশনার মধ্যে রয়েছে– অদিতি মহসিন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, শামা রহমানের রবীন্দ্র সংগীত; খায়রুল আনাম শাকিল, ড. নাশিদ কামাল, ফাতেমা তুজ-জোহরার নজরুল গীতি; আইজিসিসির নৃত্যগুরু ওয়ার্দা রিহাব ও তাঁর শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় রবিঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'; আইজিসিসি শিক্ষিকা মুনমুন আহমেদ ও তাঁর শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় কত্থক নৃত্য; বাংলাদেশের প্রখ্যাত সুরকার আজাদ রহমানের পরিবেশনায় বাংলা খেয়াল, সেলিনা আজাদের আধুনিক গান; অলককুমার সেনের গজল, চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পর পর দু'বছর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, যোগবিষয়ক কর্মশালা ইত্যাদি।

আইজিসিসির পরিচালক শ্রীমতী জয়শ্রী কুণ্ডুর নেতৃত্বে পরিচালিত আইজিসিসি দলের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এ অনুষ্ঠানগুলির কোনটিরই আয়োজন করা সম্ভব হত না। গত তিন বছরে শ্রীমতী কুণ্ডু আইজিসিসির কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এবং এটির প্রচার ও প্রসারে তাঁর প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। তাঁর মেয়াদ পূরণ ও দায়িত্বভার হস্তান্তরের প্রাক্কালে আমি তাঁর প্রতি এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমি আগামী বছর বা এরকম কিছু সময়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত কিছু বিষয় ভাগাভাগি করতে চাই।

- কর্মশালা/ সেমিনার: আইসিসিআর-এর সামনে রাখা আমাদের অন্যতম একটি প্রস্তাব হল সংগীত ও নৃত্যকলায় বিশিষ্ট শিল্পীদের

২৮ মে ২০১৮ ভারতীয় হাই কমিশনে নতুন সদস্যদের স্বাগত এবং কার্যকাল সমাপ্ত হওয়া সদস্যদের বিদায় জানানো হয়

নিয়ে কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজন। এটি বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে এবং এই ধরনের বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে আমাদের সহায়তা করবে।

• প্রখ্যাত শিল্পীদের সফর: আইজিসিসি ভারত ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের সফর বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। আমি চাই এ-সব শিল্পী যেন ঢাকা ও কলকাতার বাইরেও নতুন নতুন শ্রোতাদের কাছে পৌঁছতে পারেন। আমরা একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে ভারতে পাঠাতে যাচ্ছি। ভারতের যেসব অংশে বাংলা উচ্চাঙ্গ সংগীত ততটা পরিচিত নয় তিনি সেসব জায়গাগুলোতে সংগীত পরিবেশন করছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা বেঙ্গালুরু ও হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আমি আমার অভিমত দিয়েছিলাম যে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক কেবল সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত নয় বরং এটি শত নয় সহস্র বছর ধরে চলে আসা সভ্যতাগত সম্পর্ক।

• সাংস্কৃতিক কর্মসূচির জন্য অবকাঠামো: বাংলাদেশের মত একটি সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্তসমাজে গুণগত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তবে, এখানে ভালমানের সাংস্কৃতিক মিলনায়তনের কমতি রয়েছে। আমরা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শে একটি আধুনিক সাংস্কৃতিক মিলনায়তন নির্মাণের সম্ভাবনা পরীক্ষা করছি।

আমি আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এবং আজকের কর্মসূচির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণদানের জন্য আমাদের শিক্ষক ড. যোগেশ বশিষ্ঠ, ওয়ার্দা রিহাব, মুনমুন আহমেদ, শ্রীমতী মাম্পি দে এবং শক্তি নোমান, শ্রী কুশল রায় এবং শ্রী শ্যামলী মণ্ডলকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমি বাংলাদেশের মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, বাংলাদেশ সরকার এবং সকল বাংলাদেশীকে আমাদের প্রচেষ্টা সফল করার জন্য তাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

বিভিন্ন ইফতার আয়োজনে হাই কমিশনার

১৮ মে ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-এর ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ

২১ মে ২০১৮ হাই কমিশনারের রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাংলাদেশ পুলিশ মিলনায়তনে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার) আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান

৩১ মে ২০১৮ হাই কমিশনারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জগজিৎ সিং নন্দাকে বিদায় এবং নবাগত প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জগদীপ সিং চীমাকে স্বাগত জানাতে ইফতার ও সান্ধ্যভোজ আয়োজনে সংসদ সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্যান্যের যোগদান

প্রচ্ছদ রচনা

শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব ও ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধন

২৫ মে ২০১৮ ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনের জন্য অন্যরকম একটি দিন। এদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব আর বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। দুটি অনুষ্ঠানেই যোগ দেন এই তিন নেতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে দু'দিনের সরকারি সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন সকালে কলকাতা পৌঁছন।

প্রথমে তিন নেতা যোগ দেন বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে। শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বভারতীর আচার্য। তবে এবারই তিনি প্রথম এলেন বিশ্বভারতীতে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আয়োজিত এ সমাবর্তন উৎসব শেষে শেখ হাসিনা, নরেন্দ্র মোদী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যান বিশ্বভারতীর পূর্বপল্লিতে বাংলাদেশের অর্থে নির্মিত ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধনে। বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে আচার্য ও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ দুটি আলাদা দেশ হলেও পারস্পরিক সহযোগিতা দুই দেশকে জুড়ে দিয়েছে মৈত্রীর বন্ধনে। আর তারই উদাহরণ হল ‘বাংলাদেশ ভবন’। তিনি আরও বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ একে অপরের পরিপূরক। এটি একটি দুর্লভ ঘটনা যেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী অংশ নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি অতিথি হিসেবে এখানে আসিনি। আমি এসেছি আচার্য হিসেবে। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। গোটা বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ নন্দিত। তিনিই প্রথম বিশ্বনাগরিক। এখনও তিনি বিশ্বনাগরিক হিসেবে রয়ে গেছেন।’

তিনি বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ গোটা বিশ্বকে আপন করে নিয়েছিলেন। আর তাঁর সেই বিশ্বভাবনার ফসল হল বিশ্বভারতী।’ শ্রী মোদী তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন বাংলায়। একই মঞ্চে তাঁর সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম বিশ্বভারতীর কোন সমাবর্তন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কোন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ৪২ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সমাবর্তনে উপস্থিত থাকলেও ছিলেন দর্শক আসনে। আজ আরও মঞ্চে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক সবুজকলি সেন। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় মানুষ এদিনের সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তন শেষে মমতাকে সঙ্গে নিয়ে দুই প্রধানমন্ত্রী

পূর্বপল্লিতে ‘বাংলাদেশ ভবনে’র উদ্বোধন করেন।

সকালে দু’দিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছয়। সেখান থেকে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে করে কলকাতা থেকে ১৮০ কিলোমিটার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে পৌঁছন। হেলিপ্যাড থেকে শেখ হাসিনা রবীন্দ্রভবনে পৌঁছলে শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় হাসিনার সঙ্গে তাঁর বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

এরপর দু’জনই সেখানে রাখা স্মারক মন্তব্য বইতে তাঁদের মতামত লেখেন। সেখান থেকে বিশ্বভারতীর প্রথা অনুযায়ী দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরী লাল ত্রিপাঠি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ সবাই হেঁটে আম্রকুঞ্জের মূল অনুষ্ঠানস্থলে আসন গ্রহণ করেন। মঞ্চে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও মোদীর পাশেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসেন। প্রথা অনুযায়ী আচার্য মোদী উপাচার্যের হাতে একটি ছাতিম পাতা তুলে দেওয়ার মাধ্যমে সমাবর্তন সূচনার নির্দেশ দেন। বেদ গান ও রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে সমাবর্তনের উদ্বোধন করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন উপাচার্য সবুজকলি সেন। সমাবর্তনে বক্তৃতা করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সবুজকলি সেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তন মঞ্চ ‘আম্রকুঞ্জ’-এ পৌঁছনোর পর সমবেত অতিথিরা সমাবর্তনের বিশেষ পোশাক পরেন। পরে শিক্ষার্থীরা অতিথিদের স্বাগত জানান।

প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ সালে এ অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন

দুপুরে ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বিশ্বভারতীর উপাচার্য সবুজকলি সেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম এবং সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর মঞ্চ আলোকিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণ শুরু করেন বাংলা ভাষায়। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন করার সৌভাগ্য হল। খুব গর্ব অনুভব করলাম। শেখ হাসিনা সময় দেওয়ায় আমার আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলাদেশ ভবন ভারত-বাংলাদেশের সংস্কৃতি বন্ধনের প্রতীক।’ তিনি বলেন, ‘গুরুদেবের গান আজ আমাদের দুই দেশের জাতীয় সংগীত। গুরুদেব আমারও প্রেরণা। আমাদের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সাম্প্রতিককালে আমাদের দুই দেশের মধ্যে চলছে এক সোনালি অধ্যায়। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে। কলকাতা-খুলনা বন্ধন ট্রেন চালু হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব চিরজীবী হোক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশা প্রকাশ করেন যে, ‘বাংলাদেশ ভবন’ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রতীক হয়ে উঠবে। তিনি শান্তিনিকেতনে আসার জন্য এবং ‘বাংলাদেশ ভবন’ উদ্বোধনের সুযোগ লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের কৌশলগত বন্ধুত্বকে অপরাপর বিশ্বের জন্য ‘দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মডেল’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিতে পারি যে উভয় দেশ সহযোগিতার এই মনোভাব ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে।’

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা পুরোপুরি কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, উভয় দেশ ভবিষ্যতেও সহযোগিতার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তিনিকেতনে ‘বাংলাদেশ ভবন’ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার করবে। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে এটি ছোট এক টুকরো বাংলাদেশ, যেখান থেকে বাংলাদেশের চেতনা প্রতিপালিত হবে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব নিজস্বভাবেই অনন্য হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সবুজকলি সেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বোন শেখ রেহানা এবং সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি, গায়ক, শিল্পীসহ উভয় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

‘বাংলাদেশ ভবন’ দেখে মুগ্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ‘দারুণ লেগেছে আমার বাংলাদেশ ভবন। দারুণ পছন্দ হয়েছে। এই বাংলাদেশ ভবনের মধ্য দিয়েই আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের চেতনায় বহ্নিমান। আমরা দুই দেশ রবীন্দ্র-নজরুল ছাড়া ভাবতে পারি না। এই বাংলাদেশ ভবন তীর্থস্থান হয়ে যাবে।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের। তাঁর গান আজ আমাদের দুই দেশের জাতীয় সংগীত। আমাদের বাংলাভাষা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বদরবারে।’ তিনি বলেন, ‘ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে। ভারত আমাদের বন্ধু দেশ। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ছিটমহল সমস্যার সমাধান করেছে।’

পরের দিন অর্থাৎ ২৬ জুন ২০১৮ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্ধমানে যান বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভূমি আসানসোলের চুরুলিয়ায় ‘কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের’ সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি গ্রহণ করার জন্য। সেখানে তাঁর সম্মানে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ স্কিম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকার ২০০৬ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের আওতায় সরকার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে থাকে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা চার বছরের জন্য বছরে ২৪ হাজার টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা দুই বছরের জন্য বছরে ১০ হাজার টাকা করে বৃত্তি পেয়ে আসছেন। এই স্কিমে এই পর্যন্ত ১০ হাজার ৯৩৬ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছেন; তাদের জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২০১৭ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর উপলক্ষে নতুন ঘোষিত স্কলারশিপ স্কিমে আগামী ৫ বছরে মোট ১০,০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে এবং এ জন্য ব্যয় হবে ৩৫ কোটি টাকা। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ১,০০০ এবং স্নাতক পর্যায়ে ১,০০০– মোট ২,০০০ শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ২০ হাজার টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। চলমান পুরনো স্কলারশিপ স্কিমের পাশাপাশি এই স্কিম চলবে।

এ বছর পুরনো স্কলারশিপের আওতায় ৪০০ স্নাতক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। নতুন স্কিমে মোট সংখ্যা ১,৬২১ জন শিক্ষার্থী– এর মধ্যে ১,০০০ স্নাতক পর্যায়ের এবং ৬২১ জন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। ঢাকা বিভাগের ৩৭৬ জন শিক্ষার্থীকে সম্প্রতি বৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর, ময়মনসিংহের শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করা হবে।

আইটেক কর্মসূচি

তরুণ পেশাজীবীদের জন্য বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স

১৯৬৪ সালে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কৌশল কাঠামোর আওতায় ভারতের উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আইটেক কর্মসূচি প্রচলিত হয় যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং যথাযথ প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর হিসাব, নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা, এসএমই, গ্রামীণ উন্নয়ন, সংসদীয় বিষয়াবলীর মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ১৬১টি সহযোগী দেশে ১০,০০০ এর বেশি প্রশিক্ষণ পর্বের আয়োজন করা হয়।

২০০৭ সাল থেকে আইটেক কর্মসূচির অধীনে ৩,৫০০ এর বেশি বাংলাদেশী তরুণ পেশাজীবী ভারতে এ ধরনের বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করেছে।

ভারত সরকার ১৯৭২ সাল থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ (আইসিসিআর) এর মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া স্নাতক থেকে পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে সকল বিষয়ে আইসিসিআর বৃত্তি দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ভারতে অধ্যয়নের জন্য ৩,২০০ এর বেশি মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা সবাই বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

● বিজ্ঞপ্তি

স্মরণ//১

ছদ্মবেশী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উন্মাতাল দিনরাত্রির সঙ্গী ছিলেন বেলাল চৌধুরী। দুজনের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। আত্মজীবনী *অর্ধেক জীবনে* এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন সুনীল। এ লেখায় পাওয়া যাবে সুনীলের চোখে বেলালের অবয়ব।

বন্ধুদের দলে সাবলীলভাবে মিশে থাকা সম্পূর্ণ অচেনা একজনকে দেখলাম, তার নাম বেলাল চৌধুরী। সম্পূর্ণ মেদহীন সুগঠিত শরীর, ফরসা রং, নিষ্পাপ, সুকুমার মুখখানিতে ঈষৎ মঙ্গোলীয় ছাপ। এই নিরীহ যুবকটি সম্পর্কে অনেক রোমহর্ষক কাহিনি (হয়তো পুরোটা সত্যি নয়, সব রোমহর্ষক কাহিনিই তো সত্যি-মিথ্যে-গুজব মিশ্রিত হয়ে থাকে) শোনা গেল। তার বাড়ি পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে, পেশা কুমির ধরা। একটা কুমির-শিকারি জাহাজে অনেক সাগর-উপসাগর পাড়ি দিতে দিতে সে হঠাৎ খিদিরপুরে এসে জাহাজ থেকে নেমে পড়েছে এবং পাসপোর্টটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মিশে গেছে কলকাতার জনারণ্যে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (মাঝে), বেলাল চৌধুরী (ডানে) ও অন্যরা। ছবি: বেলাল চৌধুরীর পারিবারিক অ্যালবাম থেকে

এবং সে একজন কবি, তাই জল যেমন জলকে টানে, সেইভাবে সে যুক্ত হয়ে গেছে কফি হাউসের কবির দঙ্গলে। পাকিস্তানের সঙ্গে তখন ভারতের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে দিনকে দিন, কয়েক মাস পরেই শুরু হবে একটি বালখিল্যসুলভ যুদ্ধ, সে রকম আবহাওয়ায় পাকিস্তানের নাগরিক হয়েও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় বিচরণ করার জন্য প্রচণ্ড মনের জোর ও সাহসের দরকার। অবশ্য বেলালের একটা দারুণ সম্পদ ছিল, সেটা তার মুখের হাসি এবং সহজ আন্তরিকতায় মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। পরে অনেকবার দেখেছি, যে-কোন বাড়িতে গেলে সে পরিবারের বাচ্চা ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলালকে ভালবেসে ফেলে। এর মধ্যে সে কমলদারও খুব চেলা হয়ে গেছে, দু'জন অসমবয়সী মানুষের এমন গাঢ় বন্ধুত্বও দুর্লভ। বেলালের মতন মানুষদের কোন একটা বিশেষ দেশের সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না, এরা সারা পৃথিবীর নাগরিক। বাউণ্ডুলেপনায়, বেলাল শক্তিকেও অনেকখানি হার মানিয়ে দিয়েছিল। বেলালের সঙ্গে পরে অনেকবার অনেক রকম রোমহর্ষক অভিযান করা গেছে, কিন্তু আলাপের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটি চিরস্মরণীয়। হল কী, খালাসিটোলায় অত্যুৎসাহে বন্ধুদের সঙ্গে মেতে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বছরখানেক ধরে উত্তম স্কচ, বার্বন ও ফরাসি ওয়াইন পান করে আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বাংলা মদের মতন অতি উপাদেয় পানীয় আমার সহ্য হল না, কোন্ মুহূর্তে যে চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেল তা টেরও পাইনি। তখন আমার সেই জড় দেহ নিয়ে বন্ধুরা খুবই মুশকিলে পড়েছিল, তাদের তখনো ভাল করে নেশাই জমেনি, বেশি রাতও হয়নি। আমার জ্ঞান ফিরে এল ভোরবেলা। চোখ মেলে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, কোথায় শুয়ে আছি। রাস্তাঘাটে নয়, শ্মশানে-মশানে, হট্টমন্দিরে নয়, একটা ঘরেই, সে-রকম ঘরও কখনো দেখিনি। চ্যাঁচার বেড়া, ওপরে টিনের চাল, ঘরখানা এমনই ছোট যে মাঝখানে একটা তক্তপোশ ছাড়া আর নড়াচড়ার জায়গাই নেই বলতে গেলে। আমার পরনে সোয়েটার-প্যান্ট-শার্ট-জুতা সবই আছে, এখানে এলাম কী করে বা কার সঙ্গে, তা কিছুই মনে নেই। চিত হয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম একটুক্ষণ, পিঠে কিসের জন্য খোঁচা লাগছে, চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে দেখি, একটা মোটা বই। সে বইটা টেনে সরাতেই সেদিকটা নিচু হয়ে গেল, তারপর ধড়মড় করে উঠে দেখি, তোশক বলতে কিছুই নেই, একটা কাঠের চৌকির ওপর নানান আকারে সাজানো বইয়ের ওপর চাদর পাতা। আমি এতগুলো বইয়ের ওপর রাত কাটিয়েছি? এটা কার ঘর, জায়গাটাই-বা কোথায়? বাইরে যেন কাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সবই নারীকণ্ঠ, কান পেতে শুনলাম, কী নিয়ে যেন ঝগড়া চলছে, তার মধ্যে অনেক অশ্লীল গালিগালাজ, তার অধিকাংশই পুরুষদের পক্ষে প্রযোজ্য, অর্থাৎ পুরুষেরা প্রতিপক্ষের মা-বোন সম্পর্কে যে-সব কুপ্রস্তাব করে, মেয়েরাই বলছে সেই সব। দরজাটাও চাটাই ও কঞ্চির, টেনে খুলতে গেলে একটুখানি ফাঁক হল মাত্র, বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। ফাঁক দিয়ে দেখে মনে হল, বাইরেটা একটা কবরখানা, মাঝে মাঝে বাটনাবাটা শিলের মতন পাথর বসানো। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম, সবটাই কি দুঃস্বপ্ন? এটা বাস্তব হতেই পারে না। মাত্র ক'দিন আগেই আমি ছিলাম আমেরিকায়, সে-ঘরের তিনদিকেই জানলা। আমার বিছানার গদিটি ছিল পালক ভরা, আর কাল রাতে আমি শুয়েছি তোশকহীন তক্তপোশে, উঁচু-নিচু বইয়ের ওপর, চ্যাঁচার বেড়ায় জানলাহীন ঘর, পরিবেশ কবরখানা, স্ত্রীলোকেরা গালাগালি বিনিময় করছে পুরুষদের ভাষায়, দরজায় তালাবদ্ধ, এটা একটা সুররিয়াল দৃশ্য, এটা কারও অবচেতনের সৃষ্টি, আমি সেখানে একটা চরিত্র হয়ে গেছি। পাখি নয়, শুনছি শুধু চিলের ডাক, এ রকম দৃশ্যে এমন আবহসংগীতই মানায়। এখন আমার বসে বসে বইগুলো পড়া উচিত? আস্তে আস্তে মাথা পরিষ্কার হতেই পেটে খিদের কামড় টের পাই। নিশ্চিত কাল বিকেলের পর কিছু খাওয়া হয়নি, খালাসিটোলায় আদা আর ছোলা, কমলদার (কমলকুমার মজুমদার) পরিহাসময় মুখ, এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। এ-রকম চেতনা হারানো, এ-রকম অ্যামনেশিয়া আমার প্রথম হল। যে-ই আমাকে এখানে আনুক, দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন! দরজাটা ধরে ঝাঁকালাম কয়েকবার। কার নাম ধরে ডাকব জানি না। এখানে কে আছে, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও! আমার চিৎকারে স্ত্রীলোকদের ঝগড়া স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েকজন উঁকিঝুঁকি মারল দরজার কাছে এসে। এই দৃশ্যটাও অলীক মনে হয়, একটা অচেনা স্থানে, অচেনা কারোর ঘরে আমি বন্দী, বাইরে কয়েকজন রমণী কৌতূহলী চোখে দেখছে। তারা কেউই 'এই বন্দিই আমার প্রাণেশ্বর' বলল না, দৃশ্যটির মধ্যে রোমান্টিকতার ছিটেফোঁটাও নেই, রমণীরা কেউ সুন্দরী তো নয়ই, যুবতীও নয়, মধ্যবয়সী

দজ্জাল ধরনের, রমণী শব্দটাই এখানে প্রযোজ্য নয়, একজনের মুখ বন-বিড়ালের মতন, একজনের স্পষ্ট গোঁফ, একজনের হাতে একতাল গোবর। তাদের চোখে বিস্ময় নেই, কোন মন্তব্যও করল না, একটু পরেই আবার সরে গেল দূরে। অর্থাৎ আমাকে বন্দীই থাকতে হবে? কতক্ষণ? কী কী অপরাধ করেছি কাল রাতে? কিছু মনে করতে পারছি না বলে অপরাধবোধ আরও তীব্র হয়। অজ্ঞাত অন্যায়ের জন্য অনুশোচনায় শিরশির করে সর্বাঙ্গ। কাল রাতে বাড়ি ফিরিনি, বাড়িতে খবর দেবারও উপায় নেই, তখন টেলিফোনের এত চল ছিল না, মা দারুণ দুশ্চিন্তা করছেন, এটা ভেবেও লজ্জা-পরিতাপে অবশ লাগে। ঘরটায় ভাল করে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, বই ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই, এখন এ রকম অবস্থায় কি বই পড়ে সময় কাটানো যায়? একটা বাঁশি থাকলেও না হয় সান্ত্বনা পাওয়া যেত, একজন বন্দী-মানুষ বাঁশির সুরে মগ্ন হয়ে আছে, এ দৃশ্যটাও এখানে মানিয়ে যায়। ইচ্ছে করলে লাথি মেরে মেরে ভেঙে ফেলা যায় চ্যাঁচার বেড়ার দেয়াল। কিন্তু কার ঘর আমি ভাঙব? দরজাটাও তেমন মজবুত নয়, টানাটানি করে সেটা ওপরের দিকে খানিকটা তোলা যায়, তলায় খানিকটা ফাঁক হয়। আমি মাটিতে শুয়ে পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার তলা দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে, পিঠ ও হাত-পা ছড়ে গেল, দরজাটা পটপট শব্দে হেলে পড়ল একদিকে, তারই মধ্যে কোনক্রমে নিষ্ক্রান্ত হওয়া গেল। মুক্তি, মুক্তি! একজন বেশ ভাল, বিলেতি জামাকাপড় পরা মানুষ যাকে এখানকার কেউ আগে দেখেনি, সে কেন সারা রাত এই একটা ঘরে তালাবদ্ধ ছিল, কেনই-বা সে দরজা প্রায় ভেঙে বেরিয়ে এল, তা নিয়ে পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকেরা কোন প্রশ্ন করল না, ভ্রুক্ষেপও করল না। জায়গাটা একটা কবরখানাই বটে, একদিকে বাঁশ ও দর্মার বেড়া দেওয়া এ রকম আরও কয়েকখানা ঘর রয়েছে, মনে হয় জবরদখল। আরও খানিকটা জমি দখল করার বিবাদে সেই স্ত্রীলোকেরা প্রমত্ত বলেই মনে হল। এ কবরখানা আগে দেখিনি, জায়গাটা কোথায়, তাও বুঝতে পারছি না। কলকাতা শহরটা আমি তন্নতন্ন করে চিনি, আগে আমার এ রকম শ্লাঘা ছিল, মাত্র এক বছরের প্রবাসে এমন বিভ্রম হয়ে গেল? সে কবরখানার বাইরে এসেও অচেনা মনে হচ্ছে অঞ্চলটি, পথ-ঘাটে মানুষজন প্রায় নেই-ই বলতে গেলে, গাড়ি-ঘোড়াও ক্বচিৎ। একটুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতন আধা দৌড়োবার পর হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটা বাড়ির গায়ে লেখা রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল। আমার চমক লাগল, এ বাড়িটি তো আমার চেনা। আগে কয়েকবার এসেছি। শুধু তাই নয়, এ হোস্টেলের সুপার আমাদের অতি প্রিয় ছোটকুদা। কবি ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সত্যপ্রসন্ন দত্ত, সবাই বলত, ওঁরা দু'জন হরিহর আত্মা। ইনি সেই সত্যপ্রসন্ন দত্তের ছোট ভাই, আমরা ছোটকুদা বলেই ডাকতাম। অতিশয় নরম মনের মানুষ। কলেজ স্ট্রিটে দৈবাৎ তাঁর দেখা পেলে আমাদের মধ্যে উল্লাসের স্রোত বয়ে যেত, শক্তি (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) ওঁকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলত, 'পনেরোটা টাকা দাও না, খুব খিদে পেয়েছে।' ছোটকুদা কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলতেন, না, মোটেই খিদে পায়নি, টাকা নিয়ে তোমরা আজেবাজে জিনিস খাবে! শেষ পর্যন্ত দিয়েও দিতেন। সেই প্রাতঃকালে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, এখন ছোটকুদা হতে পারেন আমার ত্রাণকর্তা। কারণ, তখন আমি অন্য একটা সমস্যা নিয়ে দারুণ চিন্তিত। কবরখানা থেকে বেরিয়েই নজর করেছি যে আমার প্যান্টের একটা পায়ের পেছন দিকে অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে, বেশ খারাপ জায়গায় ছেঁড়া, দেখা যাবেই। সেটা আগের রাত্রেই কখনো হয়েছে, কিংবা দরজার তালা দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময়, তা কে জানে। আমার বিদেশি দামি প্যান্ট ছেঁড়ার আফসোসের চেয়েও বড় কথা, এই অবস্থায় আমি বাড়ি ফিরব কী করে? আগের রাত্রে না ফেরার জন্য কোন মুমূর্ষু বন্ধু সম্পর্কে করুণ কাহিনি না হয় বানানো যায়, কিন্তু এতখানি ছেঁড়া প্যান্টের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? দারোয়ানকে প্রায় ঠেলেই আমি উঠে গেলাম সুপারিনটেনডেন্টের কোয়ার্টারের দোতলায়। ঘড়ি পরার অভ্যেস আমি আগেই ছেড়ে দিয়েছি, ঘুম ভাঙার পর এত কাণ্ড করার পর আমার খেয়ালই হয়নি যে এখন মাত্র পৌনে ছটা বাজে, ছাত্ররাই কেউ জাগেনি, সুপারের এত তাড়াতাড়ি জেগে ওঠার কী দায় পড়েছে? আমার ডাকাডাকিতে ছোটকুদা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। এরপর আমি যে কাণ্ডটা করলাম, সেটাও প্রায় সুররিয়ালিস্টিকই বলা যেতে পারে। তখন

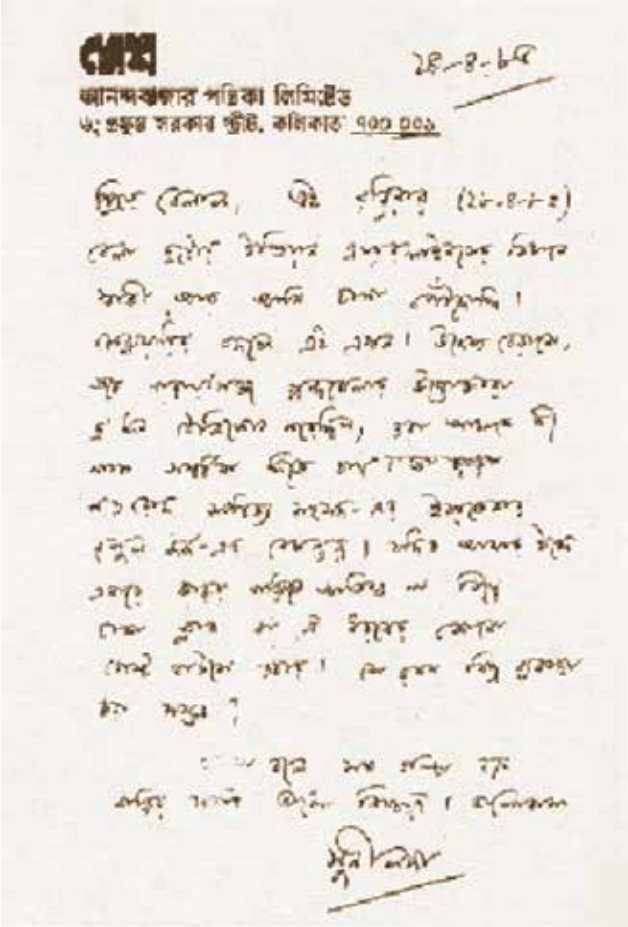

আমার চিন্তা সম্পূর্ণ একমুখী, ছেঁড়া প্যান্ট! ছোটকুদা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার হে, এত সকালে? এদিকে কোথায় এসেছিলে? এর উত্তরে ভদ্রতাসূচক যেসব ভণিতা করা উচিত ছিল, তা ভুলে গিয়ে আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, ছোটকুদা, একটু সুচ-সুতো দিতে পারেন? ছোটকুদা প্রথমে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কইলা? কী চাইলা?' আমি একইভাবে বললাম সুচ-সুতো। এই দেখুন প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করতে হবে। ছোটকুদা হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তাঁরও তো ঘুমের ঘোর কাটতে কিছুটা সময় লাগবে! কিন্তু তিনি জানতেও চাইলেন না প্যান্টটা অমনভাবে কী করে ছিঁড়ল বা কোথা থেকে এসেছি আমি। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। বসো, আগে চা খাও। গরম গরম ফিশ ফ্রাই খাবে। আমাদের কুক খুব ভাল ফিশ ফ্রাই বানায়। আর প্যান্টটা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে এস। সেলাইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' এবারে আমার হতভম্ব হবার পালা। এত সকালে ফিশ ফ্রাই? কী হচ্ছে আজ ভোর থেকে? সবই অলীক, সবই অবাস্তব। জিজ্ঞেস করলাম, ছোটকুদা, আপনি চায়ের সঙ্গে ফিশ ফ্রাই খান? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের কুক খুব ভাল বানায়, আগের রাত থেকে ম্যারিওনেট করে রাখে। সকালে প্রথম কাপ চায়ের সঙ্গে ফিশ ফ্রাই খায়, এমন মানুষ কি ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি আছে? ছোটকুদা কি এই পৃথিবীর, না অন্য গ্রহের? কিংবা, এ-রকম কিছু কিছু মানুষ আছে বলেই পৃথিবীটা এত বর্ণময়! পরে জেনেছিলাম, আগের রাতে আমি অকস্মাৎ অচেতন এবং অসাড়-শরীর হয়ে যাবার ফলে বন্ধুরা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য তারা যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার নাগেরবাজারের বাড়ি অনেকেই চেনে না, তা ছাড়া ওই অবস্থায় ট্যাক্সিতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তাতে অনেক ভাড়া। এ রকম পরিস্থিতিতে কেউ কেউ দায়িত্ব এড়িয়ে সরে পড়ে, কেউ কেউ বুক দিয়ে আগলে রাখে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই বেলাল আমার দায়িত্ব নিয়েছিল। তখন বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র উৎপলকুমার বসুই

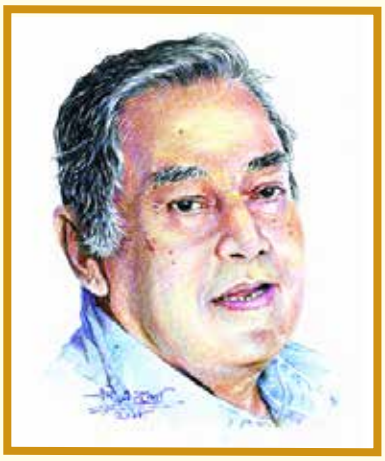

কোন বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডায় আমরা বেলালকে নিয়ে গেছি, হয়তো কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার, বেলালকে তারা আগে দেখেইনি। কিছুক্ষণ পানাহারের পর কথা বলতে বলতে বেলাল হঠাৎ অজ্ঞান এবং পাথর। তাকে বাধ্য হয়েই সেখানে শুইয়ে রেখে আমরা চলে গেছি, কিন্তু কোন বাড়িতেই বেলাল সম্পর্কে সামান্যতম অভিযোগও শোনা যায়নি। এবং তরুণীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা আমাদের কাছেও ঈর্ষণীয় ছিল। অন্য দেশের নাগরিক হয়েও কলকাতার এক অজ্ঞাত কবরখানায়, জবরদখল জমির বাড়িতে, তাও কুড়ি-পঁচিশ টাকার ভাড়ায় বেলাল যেভাবে দিনযাপন করেছে তাতে মনে হয়েছে, এ ছেলে নিশ্চিত কোন ছদ্মবেশী রাজকুমার।

নিজের বাড়ি বিক্রি করে সাহেবি কায়দায় আধা সাহেব পাড়া রয়েড স্ট্রিটে একলা ফ্ল্যাটে থাকে, সেখানে অনেকেই হুলোড় শেষে রাত্রিযাপন করে। আমাকে সেখানেই শুইয়ে রাখা যেত, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বেলাল আমাকে নিজের ঘরে রেখে আসে। বাইরে থেকে তালা দেবার কারণ, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার জ্ঞানও আমার ছিল না, দরজা খোলা রাখলে পাশের বস্তির ছেলেরা ভেতরে ঢুকে অনেক কিছু চুরি করে নিতে পারত। চুরি করার মতন সম্পদ বেলালের ঘরে প্রায় ছিলই না বই ছাড়া, তা কে আর নেবে! কিন্তু দেশের চোর-ডাকাতেরা এমনই ছ্যাঁচড়া যে বেলালের চৌকির নিচে রাখা দু-একখানা জামাকাপড় বা থালা-গেলাসও নিতে পারে, তা ছাড়া আমার গায়ের সোয়েটারটা বেশ দামি। নেবার মত কিছু না পেলে রাগের চোটে চোর-ডাকাতেরা খুনও করে যায়! জীবনে ওরকমভাবে অচৈতন্য আমি একবারই হয়েছি। পরের বহু বছর ধরে দেখেছি, ও রকম তুরীয় অবস্থায় পৌঁছবার অধিকার আসলে বেলালেরই একচেটিয়া। স্থান-কাল-পাত্র কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। এমন অনেকবার দেখেছি, কোন বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডায় আমরা বেলালকে নিয়ে গেছি, হয়তো কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার, বেলালকে তারা আগে দেখেইনি। কিছুক্ষণ পানাহারের পর কথা বলতে বলতে বেলাল হঠাৎ অজ্ঞান এবং পাথর। তাকে বাধ্য হয়েই সেখানে শুইয়ে রেখে আমরা চলে গেছি, কিন্তু কোন বাড়িতেই বেলাল সম্পর্কে সামান্যতম অভিযোগও শোনা যায়নি, বরং সে-সব পরিবারের সঙ্গে বেলালের দীর্ঘস্থায়ী সুসম্পর্ক হয়ে গেছে। এবং তরুণীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা আমাদের কাছেও ঈর্ষণীয় ছিল। অন্য দেশের নাগরিক হয়েও কলকাতার এক অজ্ঞাত কবরখানায়, জবরদখল জমির বাড়িতে, তাও কুড়ি-পঁচিশ টাকার ভাড়ায় বেলাল যেভাবে দিনযাপন করেছে তাতে মনে হয়েছে, এ ছেলে নিশ্চিত কোন ছদ্মবেশী রাজকুমার। আমি সে রকমভাবেই বেলালকে গ্রহণ করেছি প্রথম দিন থেকে। এ রকম বেপরোয়া সাহস আমার কোন দিনই ছিল না। আমি নিজে যা পারি না, তা অন্য কারও সহজসাধ্য দেখলে আমার শ্রদ্ধা হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভারতের প্রয়াত কথাসাহিত্যিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুন

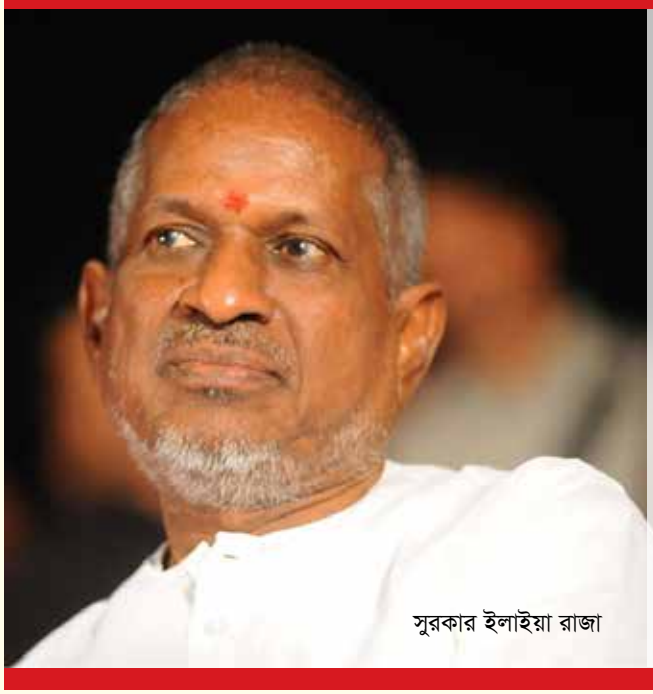

সুরকার ইলাইয়া রাজা

০১ জুন ১৮১৪ ❖ কলকাতায় ভারতীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা
০৩ জুন ১৯৪৩ ❖ দক্ষিণী সুরকার ইলাইয়া রাজার জন্ম
০৫ জুন ১৯৬১ ❖ টেনিস তারকা রমেশ কৃষ্ণণের জন্ম
০৯ জুন ১৯০০ ❖ সাঁওতাল নেতা বিরসা মুণ্ডার মৃত্যু
১১ জুন ১৯০১ ❖ প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
১৬ জুন ১৯২৫ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৪ ❖ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৭ ❖ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জন্ম
২০ জুন ১৯২৩ ❖ 'রূপদর্শী' গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম
২২ জুন ১৯১২ ❖ সাগরময় ঘোষের জন্ম
২৫ জুন ১৯২২ ❖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু
২৫ জুন ১৯৪১ ❖ গুরুসদয় দত্তের মৃত্যু
২৬ জুন ১৮৩৮ ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৬৪ ❖ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৭৩ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু
২৯ জুন ১৮৯৩ ❖ সংখ্যাতত্ত্ববিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্ম
২৯ জুন ১৯৩৮ ❖ বুদ্ধদেব গুহর জন্ম

স্মরণ//২

অবিনাশী বেলাল ভাই

খোরশেদ বাহার

কবি বেলাল চৌধুরী সম্পর্কে ক্ষুদ্র পরিসরে কলম ধরবার যে মহান দায়িত্ব *ভারত বিচিত্রা*র তরফে আমাকে দেওয়া হল, তার পর থেকেই আমি কিছুটা আত্মমগ্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। এটি সত্য যে কবি বেলাল চৌধুরী কিংবা আমার সারাক্ষণের বেলাল ভাই আমার অতীব ঘনিষ্ঠ এবং আত্মার একজন পড়শী। দীর্ঘ সোয়া এক যুগের ভাববন্দী দুই ভিন্নমাত্রার মানুষের মনের ঘরে একসঙ্গে বসবাস। একই ঘরে একই কুঠুরিতে সেখানে প্রতিদিনই একঝলক দখিনা বাতাস হয়ে বেলাল ভাই এসে আমাকে স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে যেতেন।

আমাদের দু'জনের বয়সের ব্যবধান দুই যুগের কিছুটা অধিক। অথচ কি স্বচ্ছ আর সাবলীল ভঙ্গিমায় দু'জন কথা বলেছি অনেকক্ষণ, গল্প করেছি অনেকটা সময় পার্কে, খোলামাঠে, রাজপথে, কলকাতার রাস্তা ধরে, নদীর পাড় বেয়ে হেঁটেছি লম্বা পথ, রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এসেছি ঠিকানায়, এরকম করেই কেটেছে বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার উত্তাপ আর উৎসবমুখর দিনরাত্রি।

যখন আমার কবিআত্মা আমার মধ্যে টগবগ করে ফুটছিল, সকাল সন্ধ্যা কবিতাগুলো বেলী ফুলের মত করে গন্ধ ছড়িয়ে টুপটাপ ঝরে পড়তে শুরু করল তখন সেটি ইংরেজি ২০০৪। পেশায় পুর প্রকৌশলী হলেও দু'চরণ কবিতা লেখার আরাধ্য সাধনা আমার সহজাত।

কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাদেব সাহা ও আসাদ চৌধুরীর মাঝে বেলাল চৌধুরী ॥ পেছনে অন্যান্যের সঙ্গে লেখক (কোট পরিহিত)

বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে কবিতা প্রসঙ্গেই প্রথম পরিচয়। এক বড় ভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। পরিচয় একটু ঝালাই করে নেওয়ার ব্যবস্থা হল। চোখের সামনে বসে আছেন ভারী দেহী *সচিত্র সন্ধানী*র বেলাল ভাই, *ভারত বিচিত্রা*র বেলাল ভাই। টেবিলে বসে লিখছিলেন *দৈনিক জনকণ্ঠে*র জন্য নিয়মিত ফিচার 'বল্লাল সেন' নামে। তারপর থেকে শুরু হল দু'জনের আলাপচারিতা। কখনও পল্টনের বাসার পাঁচ তলায় লাইব্রেরি রুমে, কখনও সেগুনবাগিচায় আমার অফিসে। কি সেই পরম প্রশান্তি আমার, যখন দেখতাম সারাদিনের ঘর্মাক্ত বেলাল ভাই ভারী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আমার অফিসের কাচের দরজা ঠেলে সোফায় শরীরটা একটু এলিয়ে দিয়েছেন। খুব ঠাণ্ডা করে চা খেতেন বেলাল ভাই। প্রায়ই পিয়ন এসে কাপ ফিরিয়ে নিতে চাইলে বারণ করতেন। নতুন কোন বই কোথাও পেলে দিব্যি আমার জন্য নিয়ে আসতেন একটি কপি কিংবা নিজের কপিটাই রেখে যেতেন আমার পড়ার জন্য। তারপর সন্ধ্যা আরও ঘনিয়ে এলে তাকে বাসায় রেখে তবে বাড়ি ফিরতাম। প্রায়শই এমন হত তিনি হেঁটে চলে যেতে চাইতেন বাকিটা পথ। কখনও তা মেনেছি কখনও মানিনি। রাত্রি গভীর হয়ে এলে প্রায়শই টেলিফোন বাজত বেলাল ভাইয়ের বুক পকেটে। বুঝতেন কিংবা বুঝতেন না, নির্ভর করত মনের গতির উপর। স্নিগ্ধতার মাপকাঠির উপর।

তাঁর সান্নিধ্যে, তাঁর সাহচর্যে পরিচিত হয়েছি অনেকের সঙ্গে। কবিতার জগতের সব উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সঙ্গে। তাঁরা একে একে কালক্রমে সবাই আমার একান্ত আপনজন। সবার মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, মেলে ধরবার কিংবা মেলে ধরতে বেলাল ভাইয়ের জুড়ি মেলা ভার। কবি রফিক আজাদ, কবি মহাদেব সাহা, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি রবিউল হুসাইন, কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কে নয়? সবার সঙ্গেই একে একে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম সময়ের পরিক্রমায়। অনেক কবি-সাহিত্যিক বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত এমন সকলেই প্রায় আমার জানাশোনা। সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক মুস্তাফা নূর উল ইসলামও স্নেহভরে ঠাঁই দিয়েছিলেন আমাকে তাঁর স্নেহের মণিকোঠায়, সে-ও ঐ বেলাল ভাইয়ের সৌজন্যেই। স্নিগ্ধ শব্দটি বেলাল ভাইয়ের খুব প্রিয় ছিল। স্নিগ্ধ পরিবেশ, স্নিগ্ধ পরশ কিংবা স্নিগ্ধ আবেশ এগুলো নিয়ে মাঝে মাঝেই বেশ খটকা লাগত। আসলে স্নিগ্ধতাটা কী? এরই স্বরূপ উন্মোচনে একদিন দীর্ঘ সময় কথা হয়েছিল বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে মুস্তাফা নূর উল ইসলাম স্যারের বাসায়। কিছুতেই এই স্নিগ্ধতার জট খোলা যাচ্ছিল না। আভিধানিক অর্থে আলোচনা নয়, পাঠকের জ্ঞাতার্থে তা বলে রাখাই ভাল। এই বাংলা স্নিগ্ধ শব্দটির মানে বেলাল ভাইয়ের মন আর মননে গেঁথে ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। তারই প্রকৃত রূপ উন্মোচনে নানা কথা। অবশেষে সময় ফুরিয়ে এল, স্নিগ্ধ অন্ধকারে দু'জন পথ হারালাম। বেলাল ভাই বললেন এ এমন কিছু যেন 'তাঁতের শাড়ি মিহি সুতোয় বোনা।/ আমার মায়ের আঁচল, ঠিক এই অন্ধকারের মত'।

তারপর শব্দগুলো অগ্রন্থিত হয়ে রইল আমার মস্তিষ্কে। কতবার বলেছি বেলাল ভাই 'মিহি সুতোর কবিতাটা'। বলতেন, 'ভুলে গেছি ওসব'। অথচ আমার মনে আছে ওই দুটো লাইন।

আমরা দু'জন হাঁটছি কলকাতার বইমেলায়। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, ভারী শরীর, ধুপধাপ ভঙ্গিতে পুরো বইমেলা চষে বেড়ালেন তিনি। তাঁর সঙ্গী থাকার সবচেয়ে বড় বিপদটা হল তাঁর কোন নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নেই। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে তার সঙ্গে কতজনার সঙ্গে যে তার সখ্য! প্রতিজনের সহজাত জিজ্ঞাসা, 'কেমন আছিস বেলাল, কখন এলি?'

এগুলো সেরে কৃত্তিবাস পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে চললাম। বসে আছেন সুনীল গাঙ্গুলি আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এই সব রাশভারী মানুষের ভীড়ে নিজেকে জড়ানো সেকি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু মুহূর্তে সব বরফ গলে জল হয়ে গেল, চাইতো কি বাষ্পাকারে উড়ে গেল ঘনীভূত সব সম্পর্কের

বেড়াজাল। টুংটাং শব্দের মধ্যে রাত্রি কখন যে মধ্যবয়সী নারীর মত ভারী হয়ে এল কেউ তো জানে না। এর মধ্যে বাংলা স্বাধীন হয়েছে কতবার, কতবার হয়েছে পরাধীন, কতবার কাঁটাতারের বেড়া গেছে উপড়ে, কতবার রবীন্দ্রনাথ দেবতার আসন ছেড়ে মাটিতে এসে দাঁড়িয়ে সবাইকে কড়া নাড়া দিয়ে চলে গেছেন শান্তিনিকেতনে, তার খবর কে রাখে?

এই আমাদের বেলাল ভাই। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আবার আমাকে নিয়ে কলকাতায়। দু'জন হাঁটছি কলকাতার রাস্তা ধরে, সকাল কিংবা সন্ধ্যায়। বেলা দশটা, শীতের সকাল। একটু চা হলে মন্দ হয় না। বেলাল ভাই বললেন কলকাতা শহরের ঘুম ভাঙে বেলা এগারটায়। সুতরাং চায়ের জন্য ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা ছাড়া কি আর করা!

বেলাল চৌধুরী চিরনবীন এক কবি। একজন সদালাপী, সহাস্য মানুষ। শিকড়ের টান তার ইদানীং। দেশ ছেড়ে বোহেমিয়ান জীবন তাঁর দীর্ঘ ভালবাসার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার খবর তেমন কিছু জানি না। কিন্তু কি বলিষ্ঠ জীবনমুখী শিক্ষা নিয়ে তিনি সদম্ভে বিস্তৃত ছিলেন এতটা সময় সংশয়হীন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দসহ বাংলার কবিকুল ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বের কে নেই তাঁর চিন্তা জগতে? কার সঙ্গে ছিল না তার আত্মার সম্পর্ক?

অফিসে বসে আছি। বেলাল চৌধুরীর জন্য আমার রিসিপশনের দরজা ছিল চির অবারিত। একবার তিনি আমার রুমে ঢুকলেন, কিন্তু একা নন। একগাদা ক্যামেরা, স্ট্যান্ড, লাইট, অপারেটর, সাংবাদিকসহ অফিস রুম সরগরম। বাঁকা চোখে দেখলাম *মাছরাঙ্গা টেলিভিশন*। বেলাল ভাই যথারীতি টেবিলে ভর করে বসে কৌতূহলের বসে সিগারেটের প্যাকেটে হাত রাখলেন। ধোঁয়া ছাড়লেন। সবার জন্য চায়ের ব্যবস্থা হল।

সংশয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বেলাল ভাই কি ব্যাপার? বললেন, ইন্টারভিউ।

সাবজেক্ট?

জীবনানন্দ দাশ।

বললাম বেশ।

বললেন, দু'জনের ইন্টারভিউ হবে।

কে কে।

আপনি আর আমি। বিষয়: দুই প্রজন্মের ভাবনায় জীবনানন্দ দাশ (বা এমন কিছু)

আমি তো বিস্মিত! কিন্তু হল এবং বেশ সরগরম আড্ডা। রেকর্ড হল কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্য আর লেখনী প্রতিভা নিয়ে। প্রকৃতির বিশালত্ব আর ব্যাপকতা নিয়ে জীবনানন্দের জীবনমুখী দর্শনের সঙ্গে দুই প্রজন্মের কোন ফারাক নেই, আছে জীর্ণতর আচ্ছাদনের ব্যবধান– তা আবার অনাবিষ্কৃত রহস্যময়তায় ঘেরা বনলতার মতই সুন্দর। এমনই ছিল আড্ডার সে ধরন, তাই ধারণ করে নিয়েছিল সেদিন টেলিভিশনের ক্যামেরা।

বেলাল ভাই সম্পর্কে লিখবার অনেক দিক থাকতে পারে। কবি বেলাল চৌধুরী সাংবাদিক, সম্পাদক বেলাল চৌধুরী, সর্বোপরি মানুষ বেলাল চৌধুরী। আগেই বলেছি কাব্য প্রতিভার স্ফুরণের ছ'টায় আমি আবিষ্কার করেছিলাম তাঁকে অর্থাৎ খুঁজে নিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমশ পথ চলায় আমি একটু একটু করে তাঁকে সত্যিই আবিষ্কার করতে শুরু করলাম। শুরু হল এক রহস্যময়তার গল্প। যেমন দেখেছি তাঁকে, তিনি কি তেমনই কিছু? না ঠিক তা নয় আরও অনেক কিছু। সদালাপী সদাহাস্য কবি বেলাল চৌধুরীর জীবনের কিছু অসম্ভব শক্তিশালী আত্মসত্তার গল্পের অবতারণা না ঘটালে তাঁর সম্পর্কে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হ্যালো, কি করছেন বেলাল ভাই?

এই আর কি, পেন পুশিং চলছে।

সত্যিই এই কলম ঘষার শব্দের সঙ্গেই বেলাল ভাইয়ের জীবন এগিয়েছে ঘষতে ঘষতে। আর্থিক স্বচ্ছলতা সেই অর্থে কখনও উপভোগ করেননি তিনি। জীবনের সমস্ত পথকে সহজ ভেবে, দুরন্ত পথে এগিয়ে যাওয়ার মত সাহসী লোক সমাজে খুব কম আছে। তিনি তাদেরই একজন। আত্মপ্রত্যয়ী, বলিষ্ঠ এবং সদাযুবক। কোনওদিন কোন আর্থিক দৈন্য কিংবা সামাজিক, মানসিক দীনতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। মানুষকে বেলাল ভাই ভালবেসেছেন নিবিড়ভাবে, আর যাকে ভালবেসেছেন একবার, তার জন্য সারাক্ষণ প্রাণান্ত ছিলেন তিনি। লেখালেখির জগতে তাঁর আনুকূল্য যারা লাভ করেছেন তারা একমত হবেন যে, বেলাল ভাই কখনও কাউকে ছোট ভাবতেন না, সবাইকে আপনার মত করেই ভাবতেন। এ গুণ নিঃসন্দেহে বিরল এবং এ নিয়েই চারিদিকে সবার মধ্যে হিংসের রেশ বিদ্যমান থাকে। অথচ তিনি ছিলেন এসব হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে। কোনওদিন প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে, আকারে কিংবা ইঙ্গিতে, পরিচিত কিংবা অপরিচিত কারও সম্পর্কে বেলাল ভাইকে আমার চেনাজানার এই যুগকালীন সময়ে কোন রকম নেতিবাচক টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে শুনিনি। তাই বলে বলবার মত কোন কারণ প্রত্যক্ষ করিনি তা কিন্তু নয়। আত্মনিমগ্ন, পরোপকারী, সদাহাস্য, নিবেদিতপ্রাণ কবি বেলাল চৌধুরীর এই জীবনদর্শনকে শুধু সাধুবাদ জানালে যথেষ্ট হবে না। তবে তা অনুকরণে যদি নিজের আত্মতৃপ্তি ঘটে, এবং সেটা রপ্ত করা যায় তবে তা মহামূল্যবান অর্জন হবে বলেই বোধ করি।

কৌতুকপ্রিয়তা বেলাল ভাইয়ের জীবনের আরেক দিক। প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন, পারতেন হাসাতে। আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠতেন তিনি অল্পক্ষণেই আপন মহিমায়। আগেই বলছি এই চোদ্দবছরের সান্নিধ্যে কতবার কত জায়গায় বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডায় মেতেছি। কত পরিচিত কত অপরিচিতজনের সঙ্গে তার হিসেব কষা ভার। সবখানেই তিনি নমস্য ব্যক্তি হিসেবেই নিজের বোধটুকু জাগ্রত রেখেছেন এবং ঘরেও ফিরেছেন ব্যতিক্রমী পদভারে । কি নির্মোহ ছিল তাঁর দৃষ্টি, আর কি উদার! ভালবাসা অফুরান ছিল তাঁর প্রান্তিক সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুদের প্রতি।

ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ে প্রতিনিয়ত যেমন ভাঙে নদীর পাড় ঠিক তেমনি প্রতিদিনের ছোট্ট ছোট্ট গল্পের মাঝে বেলাল ভাই ভেঙেছেন আমার মধ্যে আর আমি বেলাল ভাইয়ের মাঝে। এমনি চলছিল সময়গুলো। হঠাৎ একদিন স্থির নয়, স্থবিরও নয়, চলৎশক্তি বিবর্জিত নয়, এক রহস্যময়তায় ঘেরা মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে দরজা ঠেলে বেলাল ভাই ঢুকলেন আমার অফিসে। তখন সন্ধ্যা। 'এই যে সন্ধ্যার য্-ফলাটা দেখছেন এটা দিলেও চলে, না দিলেও চলে', বলেছিলেন বেলাল ভাই। যাহোক, প্রসঙ্গে আসি। সুনীল গাঙ্গুলি চলে গেছেন পরপারে। তাঁর বোহোমিয়ান জীবনের অর্জিত ঝুলির এক বিরাট অংশ জুড়ে যে সুনীল আর শক্তি, সেই সুনীলদা নেই। কেমন করে সইবেন তিনি? সমস্ত মুখখানা বিষাদমাখা। আমিও ততদিনে সুনীলদার দৃষ্টিসীমার মাঝে চলে এসেছিলাম। শুধু দু'জন দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। কথা হল না কিছুই।

তারও কিছুদিন পর। কি যে কারণে আবারও সেই সন্ধ্যায় বেলাল ভাই এলেন অফিসে, বসলেন। অনেকক্ষণ কথা হল। অমৃতে অরুচির মত করেই ঢোক গিললেন। বসে থাকতে থাকতে জানতে চাইলাম মনের খবর। বললেন দশদিকের কোন দিকের কথা বলবেন তিনি, তবে কলকাতা হয়ে দিল্লি যাবার গল্প শোনালেন। ফিরবেন শীঘ্রই। তিনি ফিরলেন না তবে শীঘ্রই খবর পেলাম কি এক ভয়ানক ব্যথায় তিনি আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এক স্নেহধন্য কবি অলক বসুর বাসায় দিন কাটাচ্ছেন। তারপর ঢাকা ফেরা। বাড়ি-হাসপাতাল, ডাক্তার-হাসপাতাল এই সব নিয়ে বিচলিত আর ভোগান্তির মধ্যে কাটছিল তার বেশ কিছুদিন।

শুধু আমি নয়, এই মহৎ মানুষের মহত্ত্বের অনুভব পেয়েছেন আরও অনেকে। তাঁদের ক'জনাকেই-বা আমি চিনি। তবে যাঁদের চিনি তার কেউই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দ্বিমত করবেন না তাঁর প্রতি এই মহত্ত্বগাথা চিত্র নিয়ে। সে সুযোগ বেলাল ভাই রেখে যাননি একেবারেই।

উপনিষদের শ্লোকের সরলার্থ থেকে যদি বিধৃত করি '... যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছ তবে তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জানিয়াছ', ঠিক তেমনই ব্রহ্মরূপী এই মহামানুষটির অতি ক্ষুদ্র কথাই আমি জেনেছি। আমার জানার পরিধির চেয়েও বেলাল ভাই ছিলেন অনেক বিস্তৃত, অনেক প্রসারিত।

ধানের খোসার মধ্যে ইষীকা (মধ্যের শাঁস) যেমন গোপনভাবে অবস্থান করে সেরকম বেলাল চৌধুরীর আত্মা দেহ মন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার দ্বারা আবৃত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন এবং থাকবেন আমাদের মাঝে। আমাদের বেলাল ভাই ছিলেন এক শুদ্ধ জ্যোতিস্বরূপ, যিনি অমৃত এবং দেশকালের অতীত। বেলাল ভাইয়ের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। তিনি অবিনাশী।

খোরশেদ বাহার প্রকৌশলী, কবি, কথাসাহিত্যিক

স্মরণ//৩

দ্বিতীয়রহিত বেলাল চৌধুরী

সুশান্ত মজুমদার

জীবৎকালের আশিবছরের সিংহভাগ সময়ে বেলাল চৌধুরী ছিলেন খেয়াল-খুশির পরিব্রাজক। তাঁর বোহেমিয়ান জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা সাহিত্যের বিভিন্ন আড্ডায় আলোচিত এবং ছাপার অক্ষরেও বহুল পঠিত। তিনি ছিলেন উড়ন্ত, কিন্তু উড়নচণ্ডে না। বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে উভয় বাংলায় তিনিই একমাত্র জীবনকে দুলকি চালে এখান থেকে সেখানে, স্থল, আকাশ ও জলপথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। দিনযাপনে ভাসমান জাহাজ, পরিত্যক্ত কবরের খোড়ল থেকে ঝাঁঝরা ছাউনি, দোচালা-চৌচালা থেকে ফ্ল্যাটে দিন গুজরান করেছেন তিনি। কৈশোরোত্তর যুবা বয়স ও যৌবনের অধিকাংশ কাল কখনো একাকী, কখনো তাঁর সোদরপ্রতিমদের সঙ্গে সৃষ্টি ও অদ্ভুতকাণ্ড দুই-ই করেছেন। জীবনের মধ্যপর্যায়ে সংসারী হয়েও বাইরের পৃথিবীর আহ্বান পুরোপুরি তিনি খারিজ করতে পারেননি।

তাঁর অন্তর্প্রদেশে ছিল উপর্যুপরি মন্থন। তাঁর বাউণ্ডুলেপনা অনুমোদন করে দেশের চালচিত্র, রীতি-প্রথা, প্রকৃতি অন্তর্লীন ধ্যানে সরবরাহ করেছে অনুকূল গুণময় ভাব। সব কবির মত কাব্যশক্তি বেলাল চৌধুরী পেয়েছেন বাংলার জলহাওয়া, জাগ্রত জীবন, প্রাত্যহিক বাস্তবতা, বাঙালি সত্তা, দেশচিন্তা ও বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা থেকে।

কাউকে না-বলতে পারার স্বভাব থেকে মানুষের একান্ত প্রয়োজনে সাধ্যমত কাজ করে দিতে নিজের লেখার টেবিলে বসার তাগিদ তিনি স্থগিত রেখেছেন। সময় খরচের মত সময় তাঁর না-থাকলেও মানুষকে সঙ্গ দিতে দেশ থেকে দেশে, জনপদে, কখনো অবলীলায় মানুষের অন্দরে প্রবেশ করেছেন। শেষাবধি ঠিকই তাঁর নিজস্ব সাধন জাগতিক ভজন সিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছে। সৃজনীশক্তির সিম্ফনি তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল। এ-জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ওপার বাংলার ষাটের দশকের আলোড়ন তোলা সুনীল শাসিত সাহিত্য পত্রিকা *কৃত্তিবাস* সম্পাদনা করেছেন তিনি। আমরা অনেকে জানি না, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পত্রিকা *দেশ*-এ কবিতা ছাপা হত পাদপূরণ হিসেবে। এদেশেও পত্র-পত্রিকায় কবিতার যোগ্য স্থান ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী*তে বেলাল চৌধুরী কার্যনির্বাহী সম্পাদক থাকাকালে কবিতাচর্চায় পত্রিকাটি কবিদের অন্তরঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য বান্ধব হয়ে ওঠে। গদ্য ও কবিতা, স্মৃতিকথা তিনি কম লেখেননি। স্মৃতিকথা *নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়*, নিবন্ধ *কাগজে কলমে*, ভ্রমণকাহিনি *সূর্য করোজ্জ্বল বনভূমি*, শিশুতোষ *সপ্তরত্নের কাণ্ডকারখানা*, *সবুজ ভাষার ছড়া*, *বত্রিশ দাঁত*, অনুবাদ *মৃত্যুর কড়ানাড়া* উল্লেখযোগ্য। আরো আয়ুষ্মান শিল্প-সাহিত্য বেলাল চৌধুরী থেকে পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হৃষ্টচিত্তে দশদিগন্তের প্রজ্ঞা-সন্ধানী আড্ডা দিয়ে সময় খরচ। তাঁর বাক্যালাপে যে উইট-হিউমার তার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে রাজধানী বিষয়ে মিতায়তনের লেখা *ঢাকা ডায়রি*তে। কথোপকথনে হাস্যোদ্দীপক উদাহরণের যোগান দিতে ছিলেন পারঙ্গম। নিজস্ব ভাঁড়ার রসে যেন পূর্ণ করে রাখতেন স্বীয় মনোজগত ক্রমাগত খনন করে।

অনেকে জানেন না, বেলাল চৌধুরী গল্প লিখেছেন। ১৯৬৩ সালে তাঁর লেখা 'অপরাহ্ন' গল্পটি *সচিত্র সন্ধানী*তে ছাপা হলে বোদ্ধা পাঠকমহলে আলোড়ন পড়েছিল। শুরুতেই লিখলেন: 'ইদানীং লতাগুল্ম, উদ্ভিদ, তৃণদাম, গাছপালা, পত্রপল্লব, পুষ্পিত কানন, শীতল জল, শৈবাল– এ সবের গন্ধ কি নির্মম আর অসহ্য মনে হয়।' কার্তিকের ঘোরলাগা অপরাহ্ন যেভাবে বেলাল চৌধুরী বর্ণনা করেছেন তা পড়ে মনে হয়েছিল আমরা গল্পে আরেকজন কমল মজুমদারকে পেয়েছি। কিন্তু গল্পের মত অস্পষ্ট আলোছায়ার কাটাকুটিতে, কুয়াশার নরম আস্তরণে সব লীন হয়ে গেল। বেলাল চৌধুরী গল্প রচনায় সক্রিয় থাকেননি।

তাঁর অন্তর্প্রদেশে ছিল উপর্যুপরি মন্থন। তাঁর বাউণ্ডুলেপনা অনুমোদন করে দেশের চালচিত্র, রীতি-প্রথা, প্রকৃতি অন্তর্লীন ধ্যানে সরবরাহ করেছে অনুকূল গুণময় ভাব। সব কবির মত কাব্যশক্তি বেলাল চৌধুরী পেয়েছেন বাংলার জলহাওয়া, জাগ্রত জীবন, প্রাত্যহিক বাস্তবতা, বাঙালি সত্তা, দেশচিন্তা ও বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা থেকে। স্বদেশ যথেচ্ছভাবে অনুরণিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। আবার বেলাল চৌধুরীরও ছিল নিজস্ব বোধ, অন্তর্মুখী প্রতিক্রিয়া, মানস ক্ষতাক্ত শূন্যতা, প্রাক্তন আশাবাদে অনাস্থা, পরিত্রাণের উপায় খোঁজার উদ্দেশে কালের কেশর জাপটে ধরার আগ্রহ, কখনো কখনো বেদনার দৃষ্টিমাখা অবলোকন। চূড়ান্তভাবে মানুষ ও দেশের দুর্দশা থেকে বেলাল চৌধুরী কবিজনোচিত নিরাসক্তি বজায় রাখেননি। শুধু ব্যক্তি নন তিনি– সমষ্টির অংশ হয়ে সরাসরি দ্রোহের দিকে পাশ ফিরেছেন। বেলাল চৌধুরী জানতেন, কবি যদি হন জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর তবে সামাজিক দায় থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই। তাঁর সমূহ অনুভব, একান্তচিন্তা ও প্রতীতি, অভিনিবেশের প্রকাশ: *নিষাদ প্রদেশে*, *আত্মপ্রতিকৃতি*, *স্থিরজীবন ও নিসর্গ*, *স্বপ্নবন্দী*, *সেলাই করা ছায়া*, *কবিতার কমলবনে*, *যাবজ্জীবন সশ্রম উল্লাসে*, *বত্রিশ নম্বর* কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। 'আপনি কবিতা লেখেন কেন?'– এই প্রশ্নে বেলাল চৌধুরী একই শিরোনামে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, 'বৃশ্চিক রাশির অসুখী, না-কি সুখী বেলাল চৌধুরী কবিতা লিখি, গদ্যও লিখি– লিখতে হয় জীবিকার জন্যে, আলসেমির জন্য তা-ও ঠিক হয়ে ওঠে না সব সময়, কত লেখা যে অর্ধপথে থমকে আছে, বাঁকা চাঁদের এলোমেলো শব্দরাশি, আবোল-তাবোল। কেবল তখনই বাঁক নিয়ে চলে গেছি কবিতার পক্ষপুটে। বলা যায় মজেছি। কতটা?– প্রায় ডুবজল, ডুবুডুবু। ডুবুরী হওয়ার স্বপ্ন ছিল যে একদা।... দেশ-কাল-সমাজ-সংসার, যুদ্ধ-বিগ্রহ-পরমাণু আবর্জনা, যোনি, ব্যাঙের ছত্রাক, শ্যাওলা-গুল্ম, ঘাস-লতাপাতা-ফুল, সৌর-পল্লীর যাবতীয় সবকিছুই কবিতার ভোজ্য। আমি কেবল ক্রমাগত ঠুকরে চলেছি।'

তন্নিষ্ঠ পাঠকও জানেন না বেলাল চৌধুরীর *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা* নামে আলাদা একটি গ্রন্থ আছে। অবগত না-থাকার কারণে আলোচকরাও তালিকায় এই গ্রন্থটির নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারির বই মেলায় বেলাল চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধের কাব্যগ্রন্থটি *সন্ধানী প্রকাশনী* থেকে বের হয়। গ্রন্থভুক্ত হয়েছে বেয়াল্লিশটি কবিতা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। উৎসর্গপত্রে বেলাল চৌধুরী লিখেছেন: 'মুক্তিযুদ্ধের অমর বীর সেনানী যাঁরা জয়বাংলা ধ্বনি তুলে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মদান করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বধূ-সন্তানদের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা সম্ভাষণ।' বাঙালি জাতির সশস্ত্র যুদ্ধ এক গৌরবময় শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তখন প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু বিভীষিকা, বেয়নেটবিদ্ধ দুঃসময়ের নয় মাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি রচনা করেছেন মৃত্যুতাড়িত ও সংগ্রামশীল পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ। স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশে জায়মান ছিল মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ চেতনা। এই সংজ্ঞাই জাতিকে দিয়েছে প্রেরণা। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের নিন্দা, সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-স্বৈরাচার বিরোধিতা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে বাঙালি বারবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত দীপ্ত চেতনার সারাৎসার নিয়ে বেলাল চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধের কাব্যগ্রন্থটি। সচরাচর দেশে বইয়ের বহিরাবরণে (ব্লার্ব) লেখকরাই বইটি সম্পর্কে বিবৃতি রচনা করেন। বেলাল চৌধুরী নিজে লিখতে সম্মত হননি। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের অনুরোধে আমাকে সে-দায়িত্ব পালন করতে হয়।

কবিতার হৃদয়-সংবাদী পাঠকমাত্রই জানেন, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অতি ব্যবহারে জীর্ণ কবিপ্রসিদ্ধি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বেলাল চৌধুরী তাই দেশজ ঐতিহ্যের সাহায্যে পুনর্নির্মাণ করেছেন স্বকীয় কাব্যাদর্শ। এ-কারণেই মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু তাঁর কবিতায় রচনা করেছে নিবিড় সম্বন্ধ।

বেলাল চৌধুরীকে সশরীরে প্রথম দেখি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিকে। এর আগে 'তাঁরে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।' তখন তিনি *সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী*র কার্যনির্বাহী সম্পাদক। মানসম্পন্ন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে *সচিত্র সন্ধানী* তৃপ্ত করছে রুচিশীল পাঠকের মনন। বেলাল চৌধুরীর 'চল্লিশ বছরের তিন বসন্ত' লেখায় আছে, 'সত্তরের দশকে সচিত্র সন্ধানী নব পর্যায়ে বেরুনোর তোড়জোড় চলাকালীন গাজী সাহেবকে (সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ) আগে থেকেই চিনতাম তবু কাইয়ুম ভাই (শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী), হক ভাই (সৈয়দ শামসুল হক) এঁদের কথায় আমিও জুটে গেলাম।... শুরুতেই আমার মাথায় ছিল পুরো ৬৪ পৃষ্ঠার একটা কাগজে যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা।'

এক দুপুরে আমি ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে জোনাকী সিনেমা হলের

পাতা ঝরার উৎসব

উত্তরায়নের মেরু বারান্দার সিঁড়ি থেকে
এইমাত্র ডেকে গেল যারা–
বৃন্ত ছেঁড়া, উদ্বেলিত রাশি রাশি
টুপটাপ শব্দ প্রতিধ্বনি;

ভোরের কুন্দকলি এখনো শিশিরে উন্মুখ!

বন থেকে বনান্তরে শাল ও শিরীষ
হেঁকে চলে দ্রিদিম দিম দ্রিদিম দিম
উদাসীন সন্ন্যাসীর মতন রুদ্রাক্ষ দিন
আসন্ন গাজনের চৈত্রের হারিয়াল;

ঠা ঠা রোদের পাঁজর ফাটা বিষম চিৎকারে
ভুবনডাঙা যেন লাফিয়ে পড়ে
খোয়াই-এর গেরুয়া প্রান্তরের ঘাড়ে...

চারিদিক সাজ সাজ রব
এবার শুরু হবে পাতা ঝরার উৎসব।

পশ্চিম পাশে আড়াইতলা বিল্ডিংয়ের নিচে ডান পাশে প্রত্যাশিত *সন্ধানী* অফিসটি পেয়ে বর্তে যাই। ঢুকে দেখি, ছোট্ট অফিস মনুষ্যশূন্য। কেবল পার্টিশনের ওপাশে ঘুরন্ত ফ্যানের নিচে জামা খুলে ফর্সা, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ একজন ডিকশনারি ঘেঁটে অর্থোদ্ধার করছেন। চশমাসহ তিনি দৃষ্টি তুলে দিতেই বলি, একটা গল্প এনেছি। নিরুচ্চারে হাত বাড়িয়ে লেখাটা নিয়ে ফের কাজে তিনি মনোযোগী হলে আমি অদৃশ্য হয়ে যাই। পরে শুনি, এই মানুষটিই বেলাল চৌধুরী। দুই সপ্তাহ পর রূপসা নদীর পাড়ের বাস্তব দুর্ঘটনা নিয়ে আমার লেখা গল্প 'জলে যৌবনে' ছাপা হয়। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দূরত্ব দ্রুত ঘুচে যেতে থাকে। কবি শামসুর রাহমানের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকীর বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, পদাবলীর কবিতা উৎসবে, ভারতীয় ও সোভিয়েত কালচারাল সেন্টারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ত দেখা-সাক্ষাতে বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। অন্যদের মত তিনি এখন আমারও বেলাল ভাই, অন্তরতরেষু। এবার কাছে থেকে তাঁর জীবনযাপন দেখার সুযোগ হয়। ঠিকই, তাঁর প্রতিটি দিনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত উদ্দাম উদার প্রবাহ। *সচিত্র সন্ধানী*র সম্পাদকীয় বিভাগে আশির দশকের প্রথমার্ধে আমি যখন যোগ দিই, বেলাল ভাই তখন ভারতীয় দূতাবাস ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* সম্পাদনা করছেন। কাজের শেষে বহুবিধ আড্ডায় তাঁর সঙ্গে আমি উপস্থিত থাকি। সম্পাদক-প্রকাশক গাজী ভাইয়ের বাসভবনে প্রতি রাতে দেশের স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকদের জম্পেশ আড্ডা হত। আমি বয়োকনিষ্ঠ, বেলাল ভাইয়ের ভাষায় পাপিষ্ঠ। বয়স ও সাইজ ছোট হওয়ায় বড়দের সাধ-স্বাদ-অনুরোধ মেটাতে আমাকে থাকতে হত সদাতৎপর। বেলাল ভাইকে নয়া পল্টন থেকে পুরানো পল্টনে তাঁর বাসায় পৌঁছে দেওয়া ছিল অন্যতম কাজ। সাধারণত গেটে দারোয়ানদের কাছে তাঁকে রেখে আসতাম।

ওই সময় প্রতি শুক্রবার ছুটির দিনে গাজী ভাইয়ের আনুকূল্যে ঢাকার আশপাশে, দূরে-অদূরে আমরা সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণে যাই। বেলাল ভাইকে তাঁর বাসার কাছাকাছি দৈনিক সংবাদের পাশ রাস্তা থেকে আমরা গাড়িতে তুলে নিতাম। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বনে-জঙ্গলে, জেলায়-জেলায়, সীমান্তের ওপারে প্রতিবেশী দেশে, কোথায় না বেলাল ভাইয়ের সঙ্গী আমরা হইনি! তাঁর উপস্থিতি মানে প্রফুল্ল মন, সরস কণ্ঠের স্মৃতিচারণা, গল্পে গল্পে সময়কে জীবন্ত করে তোলা। মনে হয় গ্রাম-গঞ্জ অবধি কোন না কোন পরিচিত মানুষ বেলাল ভাইয়ের আছে, নচেৎ আবার দেখা হওয়ার উপলক্ষে ভিন্ন লোক অত দ্রুত ব্যাকুল কীভাবে হয়!

বেলাল ভাই ঢাকা না কলকাতার মানুষ– আলাদা করা যেত না। এপার ওপার উভয় জমিনের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ডান-বাম কার না সখা তিনি। জ্ঞানগোচরজন থেকে বারোয়ারি মানুষ, দু'কলম লিখিয়ে থেকে বরণীয় ব্যক্তি– কার সঙ্গে না তাঁর বন্ধুত্ব। তাঁর কল্যাণে আমরাও পরিচিতির পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়ে গেছি। একবার তিন জ্যেষ্ঠসহ আমরা ক'জন ত্রিপুরার আগরতলায় সড়ক পথে বেড়াতে যাই। এবার দেখতে চাই এখানে কাউকে বেলাল ভাই কিংবা ত্রিপুরার কেউ বেলাল ভাইকে চেনেন কি-না। আগরতলা থেকে দূরে বাংলাদেশের প্রায় সীমান্তঘেঁষা জলের মধ্যে দাঁড়ানো পুরনো আমলের নিরমহল আমরা দেখতে গেছি। ইতিহাস ও স্থাপত্যকলার পাঠ নিয়ে ডাঙায় উঠেই বেলাল ভাই পেয়ে গেলেন স্থানীয় কক্‌বরক ভাষার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিংকে। প্রৌঢ় কবি বেলাল ভাইকে পেয়ে রীতিমত প্রাণবন্ত যুবক হয়ে গেলেন। আগরতলায় ফিরতেই দেখি আগমনের খবরে দর্শনদানে হোটেলের রিসিপশনে বসে আছেন কবি রাতুল দেববর্মন ও স্থানীয় অক্ষর প্রকাশনীর প্রকাশক। পরদিন ছিল বিশ্বকর্মা পূজা। সকালে ঘুরতে বেরিয়ে শহরের একটা পুকুরের মধ্যে পূজার মণ্ডপ দেখে বেলাল ভাই বাঁশের সাঁকো ধরে চলে গেলেন সেখানে। কিছুক্ষণ পর দেখি, মহাউল্লাসে মুখে কথার খই ফোটাতে ফোটাতে বেলাল ভাই ও পূজারীরা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসছেন। ব্যস, বেলাল

ভাইয়ের চোখ-মুখ যেন নীরবে বলছে– কি হে, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।

২০০৪ সালে আমরা লেখক শিল্পী-অভিনেতা-সম্পাদক-গায়ক, কেউ কেউ সস্ত্রীক, গাইড ট্যুরের দৃষ্টিনন্দন আধুনিক দোতলা লঞ্চে সুন্দরবন বেড়াতে যাই। কারো কারো প্রথম সুন্দরবন যাত্রা। অতএব, চোখ ডুবিয়ে মন ভরে অনুপুঙ্খ সব দেখা। পৌঁছনোর পর দিন বোটে চড়ে আমরা গভীর বনের এলাকা কটকায় গিয়ে নামি। এখান থেকে পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পৌনে একঘণ্টার মত হেঁটে আমরা গাছগাছালির জড়াজড়ি পার হয়ে সমুদ্রের দেখা পাই। মাঝারি আকারের, পরিচ্ছন্ন সমুদ্র সৈকত, মনে হয় এটা নতুন জেগে ওঠা কুমারী সৈকত। পাশাপাশি দলবেঁধে না গেলে বিপদ, সরু পথের দু'পাশের ঘন ঝোপের মধ্যে বাঘমামার নিঃশব্দ চলাচল আছে। ক্লান্ত, ভ্রমণপিপাসুরা আবার বোটে চড়ে লঞ্চে ফিরে গেলে আমরা তিনজন কটকার পুরনো ধাঁচের কাঠের অবজারভেশন টাওয়ারে উঠে পড়ি। বেলাল ভাই অত উঁচু থেকে অনেকক্ষণ চারপাশে নজর টেনে এমনভাবে চাইলেন যেন এই নিবিড় জঙ্গল, জটবাঁধা গাছপালা, আলোবঞ্চিত আড়ালের জীবজন্তু, ডালের রঙিন পাখি সব তাঁর পুরনো বন্ধু– অনেকদিন পর সাক্ষাৎ। বাওয়ালিদের জন্য বনের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় মিষ্টি জলের পুকুর আছে। ক্রমাগত সমুদ্রের লবণ জলপানজনিত অসুস্থতা থেকে বাঁচতে মানুষ-জীবজন্তু-পাখি একই পুকুরের জল পান করে। বনের মধ্য দিয়ে পাড়ি দেওয়ার সময় চারপাশে বালি, ভেতরে কাটা লাল মাটির পুকুর দেখেছিলাম। হঠাৎ বেলাল ভাইয়ের উচ্ছ্বসিত স্বর। টাওয়ার থেকে নিচে টান টান আঙুল তুলে দেখালেন– পুকুরে নেমে বড় একটা বাঘ ইচ্ছামত জল পান করছে। আমাদের জন্য চরম বিস্ময়! এত সহজে সুন্দরবনে রাজদর্শন, কেউই ভাবিনি। নিজেরাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে জমে গেছি। বেলাল ভাইয়ের চোখ বটে! দেখ, বলে টাওয়ারের উত্তরে যেখানে বুনো ঘাসের বিস্তার ওদিকে চোখ দিতে বললেন। সম্ভবত গোলপাতা কাটা শ্রমিক হবে, সে ঘাড়ে মাটির কলস নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে। উদাসী মনে হেলে-দুলে তাঁর গমন দেখে বেলাল ভাই বললেন: ব্যাটা মনে হয় শান্তিনগর বাজারে যাচ্ছে, বাঘের সঙ্গে বাজার করবে। মুহূর্তে আমাদের কণ্ঠ থেকে তুমুল হাসি উড়ে যায়। কাছাকাছি থেকে হাসির এই আওয়াজে বাঘটা লাফ দিয়ে পুকুর ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। সুন্দরবন ভ্রমণ ও বাঘ দেখার এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বেলাল ভাই কলকাতা থেকে প্রকাশিত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত *ভ্রমণ* পত্রিকায় লিখেছিলেন। বেলাল ভাইকে নিয়ে মনের গভীরে কত স্মৃতি আজো টাটকা। মনে হয় না, সময়ের উপর্যুপরি প্রহারে বেলাল ভাইবিষয়ক পুরনো দিনের ঘটনাবলী সহসা ধূসর মলিন হবে! কখনো একান্ত ব্যক্তিগতভাবে, কখনো তাঁর ঘনিষ্ঠতায় পাওয়া ব্যক্তিত্বের উত্তপ্ত স্পর্শের শরিক আমরা।

সুদীর্ঘ দিনের জমানো ক্লান্তি মুছে সাময়িক সুখ এবং দু'চোখ জুড়িয়ে ঘুমানোর জন্য বেলাল চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন কন্যা মৌরী ও পুত্র পাবলোর সান্নিধ্যে দিনযাপন করতে। ২০১৪ সালে একুশে পদকপ্রাপ্তির পর এবং তা গ্রহণে তিনি দেশে ফেরেন। এই বছরের ৯ মে কলকাতা সাহিত্য আকাদেমির অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতার চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে তিনি চলে আসেন দেশে। ঢাকার কমিউনিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে তিনি ইনফেক্শনে আক্রান্ত হন। তখন চিকিৎসার জন্য তাঁকে নেওয়া হয় ধানমন্ডির হাসপাতালে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে যান স্থায়ী হাসপাতালবাসী। এ-সময় তাঁকে কাইয়ুম চৌধুরী ও গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁকে তাঁর দুই পরম সুহৃদ কাইয়ুম চৌধুরী ও গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমাকে দিতে হয়েছে। এখন আশি বছর বয়সে বেলাল চৌধুরী 'আসি' বলে স্থায়ীভাবে আমাদের ছেড়ে গেলেন।

চিকিৎসকের তথ্য অনুযায়ী, কখনো পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি, বেলাল চৌধুরীর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বুঝতে পারি তাঁর পার্থিব জীবনের অবশ্যম্ভাবী অবসান আসন্ন। তাঁর সৃষ্টিশীল হাত মৃত্যুর মুঠোর মধ্যে ক্রমশ অসহায়। তাঁর নির্বাক মুখে নেমে এসেছে ছায়া– মুছে যাচ্ছে অবয়বের দীপ্তি। আর ভুবনডাঙা চষে বেড়ানো পাজোড়া নিস্পন্দ। তারপর ২৪ এপ্রিল ২০১৮ মঙ্গলবার দুপুরে আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল হাসপাতালে 'এসেছি ঢের দূর, আর নয়' জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিঁড়ে যায়। সাহিত্যের স্বপ্নতাড়িত এক চরিত্রের জীবনাবসান হল।

সুশান্ত মজুমদার গল্পকার

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে একুশে পদক গ্রহণ

বেলাল ভাই, আপনিই বলুন

রবিউল হুসাইন

আশ্চর্য এইভাবে কেউ যায় নাকি,
একটা প্রস্তুতি বলে কথা আছে–
বলা নেই কওয়া নেই ব্যাপারটা কী,
ভালই তো ছিলেন বিছানায়
শুয়ে শুয়ে কাউকে না চিনে
না জেনে না শুনে শুধু ড্যাব ড্যাব
করে একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে–
এভাবে কেউ যায় না, যেতে হয় না,
এ রকম যাওয়াটা ঠিক না, একেবারেই না;
আপনারা এইভাবে একে একে
আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমরা
কী নিয়ে থাকব, কাদের নিয়ে থাকব,
কীভাবে থাকব, কেমন করে
কী রকমভাবে বেঁচে থাকব
বেলাল ভাই, আপনিই বলুন।

কবি বেলাল চৌধুরী, অশ্রুতে লিপিবদ্ধ

দুলাল সরকার

অশ্রুতে লিপিবদ্ধ কবিতাটির চেয়েও জরুরি তোমার শূন্য
চেয়ারে পুনর্বার ফিরে আসা, গাদা গাদা বইয়ের ভীড়ে
শ্মশান থেকে ফিরে এসে গায়ে ছাইভস্ম মাখা...
সুনীল ও শক্তির সাথে ছায়াপথের এই ক্ষুদ্র নীল গ্রহটিতে
তোমার সশরীর উপস্থিতি, সকলকে ভালবেসে
প্রশ্রয় দেবার এমন ব্যকুলতা....
দিবানিদ্রার সামান্য সময়টুকুও স্বেচ্ছায় দান করতে কোন তরুণ কবিকে;

কোন অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে নদীপাড়ে কিংবা
কলকাতা ও ঢাকার রাস্তায় তোমার সৌজন্যে নেমে আসা
অসংখ্য দূতপরী আঁচলে জড়াত গায়ের মাটি,
ভুবনডাঙার উদাসী শিহরন তোমাকে খুঁজে না পাবার বেদনায়
অজয়ের তোলপাড় কে সামলাবে বল যদি পৃথিবী জুড়ে
সবাই ডাকি... দেখে যেতে একুশের বইমেলা, সবুজ পাতার মহলে
আভাসিত তোমার মানব সম্পর্ককে কুড়িয়ে নিয়ে বলবে, 'একটা কবিতা দাও'
এমন ঔদার্যে বিকেলে তোমার টেবিলে নেমে আসা
চড়ুইদম্পতির সঙ্গে বসে কে দেবে কবিতার সাক্ষাৎকার?

আহা, ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া সহমর্মিতার এমন দুঃসময়ে
তুমি কি পথ চিনে আসতে পারবে? কিছুদিন পরে হলেও
জীবনের প্রতি উৎসাহী হয়ে, ধর্মান্ধের বিরুদ্ধে বিপন্ন ঢাকা ও কলকাতায়?

কবিতার নিষাদ প্রহর

শামীমা চৌধুরী

নিষাদ প্রদেশ থেকে তীরধনুক হাতে কে তুমি
খোলা গায়ে, শ্বেতপদ্মের মত প্রসারিত সুরভিত
করলে বাংলা কবিতাকে, কে তুমি?
শর্শদি গ্রামের উর্বরা ফসলী জমি পেরিয়ে
কঠিন পাথুরে মাটিতে রক্তাক্ত হল দু'টি পা
তারপর হাঁটছ তো হাঁটছই বনবাদাড় পেরিয়ে।
গৌরবের একাত্তুরে লাল-সবুজ পতাকা
তোমাকে করল উদ্বেলিত। স্বপ্নের স্বদেশের
সোনালি গমের উচ্ছ্বাসের দিকে আঙুল তুলে বললে,
ওই আমার শৈশব-কৈশোর আমার গৃহকোণ
আমার কবিতার কমলবন যাকে ফেলে গেছি অনাদরে।
দু'হাতে স্বপ্ন ওড়াতে ওড়াতে ফিরে এলে
শিমুলের বাগানের মৌতাতে সবুক্তগীন।
বন্দী স্বপ্ন সেলাই করা ছায়ার ভেতরে
তোমাকে দেখল কবিতার গ্রামবাসী
তোমার দীঘল শরীরে ওরা পরাল শস্যদানার
কবিতার কারুকার্যময়
ভালবাসার কোর্তা আর সেই তুমি
আবার পালালে সেই ভিন দেশে যেখানে
যাবজ্জীবন সশ্রম উল্লাসে কাটবে তোমার
কবিতার নিষাদ প্রহর।

সাদৃশ্যে ও ঐকতানে

হাসান হাফিজ

একদিকে ঢাকার বাংলাবাজার।
আরেক দিকে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট।
কোথায় যেন একটা মিল। কোথায় যেন একটা সুরের ঐকতান।
নতুন বইয়ের ঘ্রাণ। উহ! ফুলের গন্ধের চেয়েও তীব্র।
এই যে মাদক নেশা সুরভিত অস্তিত্বে, মননে। আলোর উচ্ছ্বাস।
চাঙাড়ি ভর্তি করে চলছে বই আনা-নেওয়া। দু'দেশেই এক দৃশ্য।
বইয়ের শরীরে-মনে একই ভাষা। বাংলা ভাষা। রক্তে যা রঞ্জিত।
ভাষা যেন নদী এক। সীমান্ত ও কাঁটাতার, রক্তচোখ বিধি ও নিষেধ
কেন সে মানতে যাবে। তার কোন ঠেকা তো পড়েনি।

বাংলাবাজারে প্রায়ই যাওয়া হয়। কলেজ স্ট্রিটের ঠাঁই মেরুদূর।
পাসপোর্ট-ভিসা লাগে, রাজনীতি-কূটনীতি কত কিছু আছে।
মনের দুয়ার কিন্তু খোলা সর্বদাই। সেইখানে এইসব নীতি-ফীতি
সমস্ত অচল। মানুষের মনে কেউ তালা দিয়ে রাখতে পারে না...

হালিম আজাদের তিনটি কবিতা

জেগে উঠছে মাধবকুণ্ড

পৃথিবী একবার এখানে তাকাও, দেখ কি বিস্ময়কর ধ্যানে
প্রকৃতি শান্তির স্বর্গ বিছিয়ে রেখেছে,
মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ঈশ্বরের জানান দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
বিশাল আকৃতির পাথরে পাথরে অজানা প্রেমের কাব্যলীলা
মাধবের গভীর কীর্তনের গজল গায়,
বিরল প্রজাতির বৃক্ষরাজি শিল্প সাধনার হাট বসেছে এখানে,
দিগন্তজোড়া ছড়ার জলরাশি পতনের শব্দে শব্দে কতকাল
ধরে শান্তির বাদ্য বাজায়,
রসিক পর্যটক ঢুলে ঢুলে মোবাইল ক্যামেরায় মাধবের কীর্তি
ধারণ করছে বুকের ভেতর, আহা, সে কি মানুষের মমতায়
বার বার জেগে উঠছে মাধবকুণ্ডের ঘুমিয়ে থাকা স্বপ্নধারা,
উঁচু টিলার বারিধারা ছড়িয়ে পড়ছে ইকোপার্কের বন্দরে,
মায়ের চোখের জল যেন, টপ টপ করে গড়াচ্ছে তারই বুকে,
মহাদেব ধ্যানে পর্বতের চূড়ায়, লতানো সিঁড়ির রূপ তাকে
প্রত্যহ আলিঙ্গন করে সবুজ শৌর্যের নিনাদ, তার নেশায়
বাজে মানবপদ্য, হঠাৎ হনুমানের চোখ হাঁকায় তার
ডেরার মুখরিত ধুপবাতির ভিড়ে,
বড়লেখার জুড়ি নদ, হাকালুকি হাওরের মাঝিদের
জারিসারির সুর ভেসে আসছে ক্ষণে ক্ষণে, এত ফুল,
এত শান্তি পৃথিবীর আর কোথাও তো দেখিনি আমি,
মাতাল স্বর্গের মাঝে লুকোচুরি খেলায় মত্ত এই দর্পিত সেতার,
ক্লান্ত চোখ মেলে বাউলের মত ক্রমেই জেগে উঠছে মাধবকুণ্ড।

সন্ন্যাস

মনের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে অন্য এক মন,
সে জ্বলে, যন্ত্রণায় গলে, পিষণে ভাঙে,
তাকে জাগাবে কোন্ জন।
দূর পথ থেকে তাকায় ক্ষুব্ধ বাউলের দৃষ্টি,
সংসারত্যাগী, বিরহে কাতর, পথই ঘর,
সে বাঁচে খেয়ে কষ্ট বৃষ্টি।

মনের ভেতর লাফায় বোবা পাথর সন্তাপে,
রাতের নিঝুম প্রহরে ওঠে আসে জনারণ্যে,
গৃহের মায়া ডাকে তাকে সুপ্ত উত্তাপে।
মনের ভেতর লুকিয়ে আছে বিবাগী এক মন,
কে এমন আছেন, ফতুর হওয়া এ সন্ন্যাসের–
পুথি গাইবেন পথেঘাটে সারাক্ষণ।

কে ভাসালো এই ভেলা

দেখ, বেহুলার ভেলা যায় যমুনার জলে ভেসে ভেসে,
আহা সে কি করুণ,
বড় বিষাদের তরীতে চড়ে
ভেলা ভাসালেন বেহুলা মা আমার,
তার সুন্দরে মানবজাতি সুন্দর হয়েছে,
প্রকৃতিও তোমার নাম জপে– বেহুলা সুন্দরী,
মেঘজমা আকাশের ছায়া তার ভেলার পাহারাদার,
টলটল জলও সেদিন তোমার ভেলার পাহারাদার ছিল,
ছোট ছোট ঢেউ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভেলার শরীর,
মাঝখানে শুয়ে আছে স্বামী লক্ষ্মীন্দর,
সে মৃত না জীবিত তা কে বলবে,
তাকে কালনাগিনী ছোবল মেরেছিল কী,
নাকি ঠিকই নাগিনীর ছোবল লক্ষ্মীন্দরকে কাবু করেছিল,

চাঁদ সওদাগর, নাকি অন্য কেউ ভাসিয়েছে এই ভেলা,
তা কে বলে দেবে,
কে বলে দেবে বেহুলার কি দোষ, তার পতিধনের শরীরে
সর্পের বিষ ছিল কি,
তা যদি নাই-বা থাকে, সে তো জীবিত, নাকি মৃত, তা কে
বলে দেবে, লক্ষ্মীন্দরের ভেলা জলের সরোবরে মৃদু টলছে।
দরদী নদীর জলেরাও এই ভেলার গুন টেনে চলেছে,
দূরে, ওপারে উঁচু পাহাড়, এই শান্ত পাহাড়ও দেখছে ভেলার মুখ,
কি ছিল সেই ভেলার ওপর,
বেহুলা স্বামীর নিথর দেহের সঙ্গী ।
ভেলার কোণায় কোণায় সতর্ক পতাকা, সাজোয়া এই যান
আরো কত কি বহন করে চলেছে,
তা কে বলে দেবে,
এ তো শুধুই ভেলা নয়,
মহাকাব্যের তরী।

এই ভেলা যাবে কি মহাস্থান গড়ে বাসরঘরের দিকে,
না অন্য কোথাও, মনসা জানে কি, জানে কি বেহুলা,
লক্ষ্মীন্দর কি জানে কোথায় চলেছে মহাস্বাপ্নিক এ ভেলা?

এবং রাজনীতি

মাসুদ মুস্তাফিজ

তুমি বরং যাও
নদীতে পার তৃষ্ণা মেটাও
কিচ্ছু আসে যায় না আমার– প্রিয়চোখ প্রলুব্ধ কর
নাচাও আর মাতাল কর কারো মন ও হৃদয়
প্রতিবাদে মুখর হবে না আমার উৎকণ্ঠা উদ্বেগ

যদি কখনো কেঁদে ওঠে তোমার নরম হৃদয় নিঃসঙ্গ
আকাঙ্ক্ষার অগ্নিশিখা গাঢ় হয় হতাশ্বাসে অথবা ক্লান্ত স্বপ্নবিচ্ছেদে
কেবল তখনি ফিরে এস– প্রত্যাবর্তন কিংবা চলে যাবার
রাজনীতির তুখোড় সংলাপের মতন

কারণ নারী আর রাজনীতি আলাদা কিছু নয়

প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা

সন্তোষ ঢালী

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসন। বাণিজ্য করতে আসা ব্রিটিশ বেনিয়া রাজত্ব করতে শুরু করে। বণিক হয়ে ওঠে শাসক। ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় ব্রিটিশ উপনিবেশ। বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষ হয়ে পড়ে পরাধীন। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর সমাজ কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রাচীন যুগের অবসান এবং নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে ভারতীয় সমাজ-জীবনে। পুরাতনের পথ ধরে নতুনের আত্মপ্রকাশ। নতুন এক সংস্কৃতির পত্তন ঘটে। তরুণদেরও বিরাট এক অংশ পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, হয়ে ওঠে হাফ ইংরেজ। ইংরেজরাও তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানা রকম কলাকৌশল অবলম্বন করে ভারতীয়দের আকৃষ্ট করছে। ব্যবসা-বাণিজ্য; শাসন ও শোষণের জন্য ইংরেজ কাসিমবাজার কুঠি স্থাপন করে, শুরু করে নীল চাষ।

পরবর্তী জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি সাহিত্য গভীর এবং ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। এর ফলে পাশ্চাত্য দর্শন, সংস্কৃতি, আদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে বঙ্কিম তীক্ষ্ণ জ্ঞান লাভ করেন; যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলে এবং ধীরে ধীরে বঙ্কিম হয়ে ওঠেন মুক্ত চিন্তার, মুক্ত বুদ্ধির একজন মানুষ। প্রথম জীবনে ইংরেজ আদর্শ ও অনুকরণপ্রিয়তা থাকলেও, পরিণত যৌবনে বঙ্কিম উনিশ শতকের রেনেসাঁর মানসপুত্র হয়ে ওঠেন।

এদেশে উৎপন্ন কাঁচামাল চালান করে দেয় বিলেতে। আর তাদের স্বার্থেই তৈরি করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একদল ভারতীয় কর্মচারী।

জন মেকলে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে ঘোষণা করেছিলেন– We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.... (লক্ষ লক্ষ লোক যাদের আমরা শাসন করি, তাদের এবং আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য একটি মাধ্যম সৃষ্টি করার প্রতি আমাদের সবিশেষ যত্নবান হতে হবে; তারা হবে এমন এক শ্রেণির লোক যারা শুধু রঙ আর রক্তের পরিচয়ে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধিতে যারা হবে ইংরেজ)। স্বভাবতই এরা স্থূল স্বার্থের জন্য ইংরেজের অনুগত। পাশ্চাত্য দর্শন, আদর্শ এবং শিথিল জীবনাচারে আকৃষ্ট হয়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরে 'বাবু' নামে এক শ্রেণির মানুষ তৈরি হয়েছিল। ভারতীয়, পারসি এবং অল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হয়ে এরা ভোগ-সুখ-বিলাসেই দিন কাটাত। 'এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাপ-আকড়াই, পাঁচালি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।' ইংরেজের তোষামোদকারী হিসেবে এই বাবুদের আবির্ভাব।

সমাজে তখন নানা শ্রেণির মানুষের নানা মতবাদ এবং নানা মতভেদের সূচনা ঘটে। এই 'বাবু' শ্রেণির মানুষ ছাড়াও ইংরেজ ও পাশ্চাত্য মতাদর্শে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত একদল তরুণ-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এরা 'ইয়ং বেঙ্গল দল' নামে পরিচিত হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর ভাবশিষ্য বা মতানুসারী। এরা উগ্র আধুনিক। এছাড়াও দু'টো দল লক্ষ করা যায়। একদল প্রাচীন-পন্থী। হিন্দু ধর্মের আদর্শ এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বেড়াজালে সমাজকে পরিচালিত করতে প্রয়াসী। আর একদল নব্য সংস্কারবাদী। এরা সমাজের মঙ্গলের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য শাস্ত্র কিংবা ধর্মীয় মতাদর্শ বা অনুশাসন যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বাকিটা বর্জনে আগ্রহী। এঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমাজ-সংস্কারক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর মত– নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা। সে ক্ষেত্রে উপশাস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করে মূল শাস্ত্রে প্রত্যাবর্তনে পক্ষপাতী তিনি। শিক্ষা ক্ষেত্রে– ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন; সামাজিক ক্ষেত্রে– যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হলেও বর্জন করে লোকহিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে– Dominion status-এর মত একটা কিছুর প্রত্যাশা ছিল রামমোহন রায়ের।

এই নানা শ্রেণির নানা মতবাদের আবির্ভাবের ফলে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই সমাজে দেখা দেয় আদর্শিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্কলহ। এর ফলে ব্যক্তি মানসে দেখা দিয়েছে দারুণ বিপর্যয়। দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের সাথে নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ও চিন্তানায়কদের এ কারণে ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠেনি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এই ব্যবধানকে আরও দৃঢ়তর করে। সামাজিক আচরণের এই অন্তর্বিরোধ তাঁদের রাজনীতিক আচরণের মধ্যেও প্রকট হয়ে ওঠে। এই অমীমাংসিত সমস্যার নিরন্তর বেদনাদায়ক চেতনা নতুন চিন্তানায়কদের মধ্যে অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল। রামমোহন রায়ের বুদ্ধিগত বিদ্রোহ থেকে যাত্রা শুরু করে, বিদ্যাসাগরের (১৮২০–১৮৯১) আমলে এ বিদ্রোহের বিস্তৃতি ও গভীরতা অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮–১৮৯৪) যুগেও এ ব্যবধান অব্যাহত থাকে।

এমনি এক অন্তর্কলহময় সমাজে যুগের মানসপুত্র হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন এই বিষয়-চেতনা, স্থান-কাল চেতনা বিকাশ লাভ করছিল, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাঙ্গে অনুভূত হচ্ছিল এবং যে মুহূর্তে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষুণ্ন হতে চলছিল– সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত।

১৮৩৮ সালের ২৬ জুন নৈহাটির কাঁটাল পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাবা যাদব চন্দ্র মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হলে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় বছর বয়সে মেদিনীপুর চলে আসেন এবং মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফ টীড-এর অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁর স্কুলে ভর্তি হন। প্রকৃতপক্ষে এখানেই বঙ্কিমের শিক্ষাজীবনের শুরু। ছেলেবেলাতেই এখানে ইংরেজ পরিবারের সাথে বঙ্কিমের মেলামেশা করার সুযোগ ঘটে। ফলত বঙ্কিমের শিশুমনের উপর ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব পড়ে। ইংরেজদের এই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের কারণে বঙ্কিমের শিশুমনে ইংরেজ-চেতনা এবং ইংরেজের অনুকরণ প্রেরণা দেখা দেয়।

পরবর্তী জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি সাহিত্য গভীর এবং ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। এর ফলে পাশ্চাত্য দর্শন, সংস্কৃতি, আদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে বঙ্কিম তীক্ষ্ণ জ্ঞান লাভ করেন; যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলে এবং ধীরে ধীরে বঙ্কিম হয়ে ওঠেন মুক্ত চিন্তার, মুক্ত বুদ্ধির একজন মানুষ। প্রথম জীবনে ইংরেজ আদর্শ ও অনুকরণপ্রিয়তা থাকলেও, পরিণত যৌবনে বঙ্কিম উনিশ শতকের রেনেসাঁর মানসপুত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় স্বাজাত্যবোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমদিকের সাহিত্য-জীবনের অন্তরালে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্ষুব্ধ হতে আরম্ভ করে। পরের দিকে তা গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার মাধ্যমে নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর শিল্পকর্মের উপর এই সাধারণ পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ চেতনার মূল ভিত্তিই হল বহির্শাসন বিরোধিতা। ভারতবর্ষকে শাসন করবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোন নাগরিক, এমনটাই আশা করতেন বঙ্কিম। কোন বহিরাগতের শাসনব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নন মোটেই। ১৭৫৭ সালের পর থেকে ভারতের শাসন ব্যবস্থা চলে যায় ইংরেজের হাতে। দিন যায়, ইংরেজের প্রতি ভারতীয়দের অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইংরেজ যাকে শিক্ষিত করে তুলল; সেই শিক্ষিত বাঙালিই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত মনিবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ইংরেজরাও কঠোর মনোভাবের অধিকারী হয়ে উঠল। উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি 'বাবুর' চাকরির সংস্থান করা খুব কঠিন সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ১৮৫০ সাল থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখস্বপ্ন ভাঙতে আরম্ভ করল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর নতুন শাসন কাঠামোয় শিক্ষিত ভারতীয়দের স্থান ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ১৮৫৯ সালে বাংলায় এক ব্যাপক চাষী-আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে যা 'নীল বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক একযোগে ধর্মঘট করে। ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকের মাঝামাঝি বাংলা ও বিহারে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ১৮৭৭ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং অন্যান্য স্থানে দুই লক্ষ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে প্রায় ৫২ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেশের এই ভয়াবহ বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে

যুগযন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম্’ সংগীত ভারতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনে উত্তাপ যুগিয়েছে। একটিমাত্র গানকে কেন্দ্র করে, একটি জাতির জীবনে এমন বিশাল আলোড়ন সম্ভবত আর কোন দেশে হয়নি। *আনন্দমঠ* উপন্যাস লেখার প্রায় ছয় বছর আগে ১৮৭৫ সালে লেখা হয়েছিল ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন– গানটির গুরুত্ব সমকালের মানুষ ঠিকমত না বুঝলেও ভবিষ্যতের বাঙালি উপলব্ধি করবে।

গভর্নমেন্ট তখন দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের (১৮৭৯) আয়োজন করছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধের তহবিলে দান করেন। অন্যদিকে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ বলে ঘোষণা করার জন্য আহুত দিল্লির দরবারের সমারোহ (১৮৭৭) শিক্ষিত সমাজের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সাময়িকপত্রে ও দৈনিকপত্রে এর কঠোর সমালোচনা ও তীব্র নিন্দা হতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ, স্বজাতিপ্রীতি, সমবেদনা ও ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে।

এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ-সংঘাত-যন্ত্রণাময় কালেরই সন্তান, আধুনিক বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবেত্তা, চিন্তানায়ক, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। স্বভাবতই সে যুগযন্ত্রণার উত্তাপ ছুঁয়েছিল বঙ্কিমের চেতনা-স্তরকে এবং তাঁর ভিতরও জন্মেছিল স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি; যা তাঁর কর্মে, সাহিত্যে প্রকাশিত। তাঁর প্রথম দিককার সাহিত্যে ইংরেজ বিদ্বেষ ততটা প্রকট না হলেও পরিণত বয়সের সাহিত্যে তা তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ স্বদেশ চিন্তার স্বরূপ বুঝতে হলে স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্কিমের সুনির্দিষ্ট মতামত কী, তা জানা দরকার। ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন– ‘বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা লিখিয়াছেন- Liberty, Independence। তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্ন দেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।’ উল্লিখিত মত বঙ্কিম সর্বাংশে সমর্থন করেননি। এ প্রবন্ধেই তার উল্লেখ পাই– ‘শাসনকর্ত্তা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।’ শাসনকর্তা স্বদেশীয় বা ভিনদেশীয় সেটা বড় কথা নয়; বঙ্কিমের মতে– রাজ্য হওয়া উচিৎ প্রজাপীড়ন-শূন্য। সে হিসেবেই তিনি সম্রাট আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলেছেন।

ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার উৎকর্ষ ঘটলেও জনমনে নানা অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। তখনকার শাসক ছিল ভিনদেশীয় এবং বিজাতীয়। তার উপর প্রজাপীড়ন ছিল বর্তমান। এ ছাড়াও অন্য দেশে অবস্থান করে শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করে। ইত্যাকার নানাবিধ কারণে ভারতবর্ষ ছিল সর্বাংশে পরাধীন। এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করবার ব্রত গ্রহণ করেন তৎকালীন প্রতিটি বিবেকবান মানুষ। সাময়িকপত্রে, সাহিত্যে, নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

বাঙালির জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মিলন-ভূমিতে স্থাপন করে মননশীল সাহিত্য, কথাসাহিত্য, দেশ ও দশের কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ও প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাঙালির মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, সংস্কারকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে, স্বাদেশিক মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তিনি যে নতুন মানব-বোধের পন্থা নির্দেশ করেন, এক শতাব্দীর বাঙালি সে পথ ধরেই চলছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্র শুধু মাসিক পত্রের আদর্শ নয়, এর মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি সমাজ আত্মদর্শনের বীজমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে যেমন রবীন্দ্রযুগ বলা হয়ে থাকে, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বঙ্কিমযুগ বলা হয়। আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলন, সমাজবিকাশ, শিক্ষা, ঐতিহ্য– কোন্‌টার সঙ্গেইবা বঙ্কিমচন্দ্রের নিগূঢ় সম্পর্ক নেই? এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর *আনন্দমঠ* ইংরেজি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা ভারতেই স্বাদেশিক ও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র যেন আধুনিককালের ঋক্‌মন্ত্র, যার দেবতা হলেন দেশমাতৃকা। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির নবযুগ চেতনা বা রেনেসাঁসের মূল সুর যে একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে– তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যুগযন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম্’ সংগীত ভারতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনে উত্তাপ যুগিয়েছে। একটিমাত্র গানকে কেন্দ্র করে, একটি জাতির জীবনে এমন বিশাল আলোড়ন সম্ভবত আর কোন দেশে হয়নি। *আনন্দমঠ* উপন্যাস লেখার প্রায় ছয় বছর আগে ১৮৭৫ সালে লেখা হয়েছিল ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন– গানটির গুরুত্ব সমকালের মানুষ ঠিকমত না বুঝলেও ভবিষ্যতের বাঙালি উপলব্ধি করবে। ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘দেশমাতৃকা বন্দনা’ রচনা করেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রি. বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এ গানটি প্রথম গাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটি গেয়েছিলেন। এরও পরে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আমলে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি ও সংগীত যথার্থ উন্মাদনা এনেছিল। শুধু গান নয়, ‘বন্দেমাতরম্’ নামে পত্রিকা বেরিয়েছে, ‘বন্দেমাতরম্’ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, ‘বন্দেমাতরম্’ নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৯০৫ সালে ‘বন্দেমাতরম্’ নামে একটি গানের বই প্রকাশ করেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর সে বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন– ‘জাতীয় সঙ্গীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূর হয় না। জাতীয় ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্তমান সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় ‘বন্দেমাতরম্’ প্রচার করিতেছে।’ ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি মুখে নিয়ে বহু বাঙালি মৃত্যুবরণ করেছে, ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করেছে। ১৯০৪-’০৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনিটির প্রভাব এ রকমই ছিল। এ গান নিয়ে তখনও কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন দেখা দেয়নি। বিশ শতকের বিশের দশক থেকে ‘বন্দেমাতরম্’ নিয়ে বিভেদের সূত্রপাত হয়। হিন্দু-মুসলিম আন্দোলনের মিলিত রূপকে ব্যক্ত করার জন্য এ সময়েই ‘বন্দেমাতরম্’ এর সঙ্গে যুক্ত হল ‘আল্লা হো আকবর’ ধ্বনি। তারপর থেকে ধীরে ধীরে কেমন করে ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ছায়া ফেলতে শুরু করে। যা ছিল দেশ-প্রেমের বীজমন্ত্র, ক্রমে তা দেখা দিয়েছিল মারণমন্ত্র হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরের এই বিপর্যয়ে, এ জন্য নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করা চলে না। বঙ্কিম এবং বঙ্কিম পরবর্তী যুগে তাঁর এই ‘বীজমন্ত্র’ স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালির তথা ভারতবর্ষীয়ের মনে যে বিদ্রোহের সঞ্চার করেছিল, তাকে তুচ্ছ করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

‘বন্দেমাতরম্’ সংগীতটি ছাড়াও *আনন্দমঠ* (১৮৮২) নানাভাবে বাঙালিকে স্বাদেশিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারণ এর কাহিনি এবং চরিত্র প্রাদেশিক শ্রেয়বোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বাংলার সমস্যা,

বাংলার সমৃদ্ধি-হীনতা, বাংলার পরাধীনতা, বাংলার দুর্ভিক্ষ– বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যথিত করেছে, চিন্তিত করেছে। তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায় *আনন্দমঠ* উপন্যাসে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে *আনন্দমঠ* রচিত। *আনন্দমঠে*র মধ্যে প্রধান ও প্রবল সুর দেশাত্মবোধ। মুঘল যুগের সমাপ্তি ও ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এর কাহিনির পট বিস্তৃত, কিন্তু বাইরে মুসলমান-বিরোধিতা থাকলেও আসলে ইংরেজ কুশাসনের বিরুদ্ধেই প্রচ্ছন্নভাবে এ উপন্যাস রচিত হয়েছিল। সরকারি কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গোপনেই রেখেছিলেন। একটু কল্পনা-কুশলী ও দূরদর্শী পাঠক এ স্বদেশপ্রাণ উপন্যাসের গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। এ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীদের উত্থান প্রসঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে ভারতীয়দের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতার কথাই বলতে চেয়েছেন। এর অগ্নিগর্ভ স্বদেশ-প্রেম ও রক্তাক্ত আত্মোৎসর্গ সন্ত্রাসবাদের যুগে বিপ্লবীদের মনে উদ্দীপনা এবং হাতে আগ্নেয়াস্ত্র জুগিয়েছিলেন। স্বাদেশিকতা, আত্মত্যাগ ও আদর্শবাদের দিক থেকে এ উপন্যাস ক্রান্তিকারী ঐতিহাসিক পথ নির্দেশক।

অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর *বঙ্কিম-মানস* গ্রন্থে বলেছেন– 'সন্তানদের সংগ্রামের ভিতর দিয়া সমকালীন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্তান নেতাদের অতুলনীয় দেশভক্তি, আদর্শবাদ, ত্যাগ এবং প্রাণশক্তির মধ্যে এবং সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়ার পরিকল্পনা ও পরিচালনার মধ্যে আন্দোলনের শক্তি। এই প্রাণশক্তি বলেই *আনন্দমঠ* এর ঘটনাপ্রবাহ তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, নিরক্ষর ফকির সন্ন্যাসীদিগকে অশ্রুতপূর্ব মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারিয়াছেন।... আবার এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বলিয়াই শান্তির পক্ষে দুই দুই বার সুদক্ষ ইংরাজ সৈনিককে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছে।... সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম ও সংগঠনের যে পরিকল্পনা *আনন্দমঠ* এ ভাষা পাইয়াছে, তাহার মধ্যেও সমকালীন আন্দোলনের শক্তি ও দূরদর্শিতার ছাপ রহিয়াছে। বিচ্ছিন্ন একক সাধনা ও মনস্কাম, মুষ্টিমেয়ের আকাশ-বিদারী চিৎকার ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে স্বর্ণ কুড়াইয়া আনিতে পারিবে না, এই বিচ্ছিন্ন মনস্কামকে সকলের, সর্বসাধারণের মনস্কামে পরিণত করিয়া তবেই তাহাকে সার্থক কর্মের রূপ দেওয়া সম্ভব। এখানেও শিল্পী-মানস ভবিষ্যতের দিকে তাঁহার অঙ্গুলি-সংকেত জানাইয়া গিয়াছেন।' এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার বলেছেন– 'বঙ্কিমের জীবন-দর্শনেরও প্রধান কীর্তি– স্বদেশপ্রীতি, তা দেখেছি। কিন্তু এ স্বদেশপ্রীতির স্বরূপ আরও স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। নিজের অজ্ঞাত মনে বঙ্কিম স্বাধীনতা চাইতেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্যতাও স্বীকার না করতেন, তা নয়। স্বীকার করতেন বলেই *আনন্দমঠে*র আখ্যানবস্তু সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ– সাধারণ পাঠক ছত্রে ছত্রে লেখকের অজ্ঞাত মনের সেই উদ্দেশ্য দেখে *আনন্দমঠ*কে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি বলেই গ্রহণ করেছে।... *আনন্দমঠে* হয়তো ইংরেজকে না চটাবার জন্য লেখকের কিছু ডিপ্লোমাসিরও প্রয়োজন ছিল– শাসকদের চোখে ধূলি দেওয়া দরকার।'

বঙ্কিম-পরবর্তী সময়ে নানাজনে নানাভাবে বঙ্কিমের স্বাধীন রাষ্ট্রচিন্তা বা স্বদেশচিন্তার বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কেউ তাঁকে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা বলেছেন, কেউ তা স্বীকার করেননি। কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক লেখক বলেছেন, কেউ বলেছেন– বঙ্কিমচন্দ্র কালের সন্তান। উনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটাই ছিল হিন্দু-ধর্ম এবং সমাজকেন্দ্রিক। গোটা সময়টাই ছিল সাম্প্রদায়িকতার রঙে রঞ্জিত। বঙ্কিমের পক্ষে কোনভাবেই তাঁর যুগের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তাই তাঁর কোন কোন রচনায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অনিবার্যভাবে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বাংলার আর কোন সাহিত্যিক সম্ভবত এতটা আলোচনা সমালোচনার ঝড় তুলতে পারেননি।

যিনি যেভাবেই বঙ্কিমকে বিশ্লেষণ করুন না কেন, তাঁকে তার কালের নিরিখেই বিচার করতে হবে। সেই সময়ে, সেই সমাজে বঙ্কিম যে চিন্তাকে লালন করেছেন, তা কতটা যুক্তিনির্ভর ছিল সেটাই বিবেচ্য। বঙ্কিম তাঁর সমকালের নাগরিক বাংলার জীবন-যাত্রাকে সাধকের ঐকান্তিকতা নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন– ধ্যানীর তন্ময়তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ভাবী সম্ভাবনার শিল্পরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠে* যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত, তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে। সেখানেও ইরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বঙ্কিম। সেখানেও প্রধান ও প্রবল সুর দেশাত্মবোধ। সবার উপরে তিনি দেশমাতাকেই স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমের যাবতীয় সাহিত্যের মূল কথাই হল স্বদেশ-প্রীতি। তিনি তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন– 'আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।... সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' তাঁর এই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নানা রচনায়। *সীতারাম* উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-ধর্মের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত। সীতারাম এমন পুরুষ যে দেশের জন্য, জাতির জন্য, স্বাধীনতার জন্য পাগল। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস ছাড়াও নানা প্রবন্ধে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং স্বদেশচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে লোকরহস্য, কমলাকান্ত, মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার স্বরূপ উন্মোচিত।

বঙ্কিমের রচিত সাহিত্যের মধ্যে রাষ্ট্রচিন্তার বা স্বদেশচিন্তার বীজটি নিহিত ছিল। বাংলায় সাহিত্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক ধারণার প্রকাশ ঘটানোর অভিনব কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রবর্তন করেন। ইংরেজের নাগপাশ থেকে দেশকে স্বাধীন করার প্রবল বাসনা বঙ্কিমের অধিকাংশ সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এই স্বদেশচিন্তার স্বরূপের সঙ্গে ধর্মকে গুলিয়ে ফেললে যুগযন্ত্রণাকেই অস্বীকার করা হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা সমালোচনা করা সত্ত্বেও আহমদ ছফা বলেন– 'আধুনিক যুগের গোটা বাঙালি সমাজে এরকম ব্যক্তি দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করেননি। বঙ্কিমের প্রভাব বাঙালির রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে এতদূর প্রভাব বিস্তারী হতে পেরেছে, অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর তুলনা চলতে পারে না।... বঙ্কিমের মত বাক্‌সিদ্ধ এবং বাক্‌সংযম লেখক বাংলা সাহিত্যে আর জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ এত প্রবল ছিল যে, একটিমাত্র ভ্রূকুটি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মতের একটি জনসভা স্তব্ধ করে দিতে পারতেন।' এখানেই বঙ্কিমের বিশেষত্ব।

তিনি যে গোটা ভারতবর্ষের স্থির চিন্তাশক্তিকে প্রবল নাড়া দিয়ে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ চিন্তা-স্রোতে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর সার্থকতা। বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বলে, হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে, পুরাণের ঋষি বলে বর্জন করলে বা অস্বীকার করলে, আমাদেরই চলার পথকে রুদ্ধ করা হবে। চাঁদের গ্রহণ লাগা দিকটা বর্জন করে বাকি অংশ গ্রহণ করলেই গোল মিটে গেল। পদ্মফুল কার না প্রিয়? সুগন্ধি শতদল মেলেই বিকশিত হয় পদ্ম। তার বোঁটাতে কাঁটাও থাকে। অন্ধ তার সৌন্দর্য দেখে না, তাই কাঁটার আঘাতে জর্জরিত হয়। সবশেষে বলতে হয়, বঙ্কিম পরাধীন ভারতের একজন বিবেকবান নাগরিক হিসেবে স্বাধীন স্বদেশভূমির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে তুচ্ছ করে দেখার কোন অবকাশ নেই। কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষকে তিনি স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। এখনও আমাদের শান্তি ও স্বপ্ন দেখান বঙ্কিম। তাই আজও, এখনও বঙ্কিম আরও আরও প্রয়োজনীয়; আরও আরও অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র

০১. বঙ্কিম রচনাবলি ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা। ১৩৯১।
০২. বঙ্কিম রচনাবলি ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা। ১৩৯০।
০৩. বঙ্কিম রচনাবলি: উপন্যাস সমগ্র, তুলি-কলম, কলিকাতা। ১৯৮৬।
০৪. বঙ্কিম-মানস: অরবিন্দ পোদ্দার; পুস্তক বিপণি, কলিকাতা। ১৯৯৮।
০৫. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত: ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা। ১৯৯৯।
০৬. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার: শ্রী ভূদেব চৌধুরী; মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা। ১৯৯৯।
০৭. পশ্চিমবঙ্গ: বঙ্কিম সংখ্যা; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২।
০৮. প্রবন্ধ সংগ্রহ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ১৯৮৭।
০৯. আহমদ ছফার প্রবন্ধ: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। ২০০০।

ড. সন্তোষ ঢালী
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক
প্রধান সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, বাংলাদেশ

সংস্কৃতি

কুড়িআট্টম

নাটক ও ভক্তির অনুপম সংমিশ্রণ

অঞ্জনা রাজন

দিনু কুড়িআট্টম কেরালার একটি প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরূপ যা মানবজাতির মৌখিক ও অধরা ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসেবে ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত হয়েছে। কুড়িআট্টম শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'একযোগে অভিনয়'। কুড়িআট্টমে এমন এক সময় ও স্থানের বর্ণনা করা হয় যখন দেবতা, দানব ও মানুষকে একসাথে দেখা যেত।

আমাদের স্থান ও কালের অনেক দূরের চরিত্রাবলী, শব্দ ও দৃশ্য আমরা প্রতিদিন ধারণ করি না; এবং যা দেখি তা বর্ণনাও করতে পারি না। এই হচ্ছে কুড়িআট্টম (কখনও কখনও কুটিআট্টমও বলা হয়), কেরালার একটি প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরূপ যা মানবজাতির মৌখিক ও অধরা ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসেবে ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত হয়েছে। কুড়িআট্টম শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'একযোগে অভিনয়'। তবে এ উপস্থাপনাশৈলীর সরল নামের পেছনে আছে এর জটিল স্তর। নাটকীয় মেকআপ, অসাধারণ শিরোভূষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অনন্য-সাধারণ যন্ত্রবাদ্য সহযোগে প্রত্যেকটি অভিনেতা সেই সময় ও স্থানের বর্ণনা করেন যখন দেবতা, দানব ও মানুষকে একসাথে দেখা যেত।

মঞ্চের সম্মুখভাগে একটি প্রদীপ স্থাপন করা হয়। মঞ্চ উপস্থাপনার সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলন, উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের ওপর শান্তিজল বর্ষণ এবং জলদগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রধান চরিত্রাভিনেতার মঞ্চে প্রবেশ ও অভিনয়ের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে।

কুড়িআট্টমের প্রধান পরিচিতি এর অভিনয়ে বা এর বিশেষ ধরনের অভিনয় কুশলতায় যার ভেতরে আছে হস্তসঞ্চালনের বিরাট মুদ্রাভাণ্ডার, চোখ-মুখের ভাবপ্রকাশ এবং অভিনেতাদের বিশেষ শ্বাসপ্রক্ষেপ। ঢোলবাদকেরা অভিনেতাদের পেছনে থেকে তাদের অঙ্গসঞ্চালন, হাতের আঙুল কিংবা চোখের পলক ফেলাকে পর্যন্ত এমনভাবে ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন যে, মুহূর্তেই একটা নাট্যরোমাঞ্চ তৈরি হয়ে যায়। প্রকৃতির বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে চরিত্রের সযত্ন মনোস্তাত্ত্বিক সমীক্ষার নির্দেশনামূলক রূপায়ন কুড়িআট্টম অভিনয়কে অভিনেতা ও দর্শক– সবার কাছে অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।

নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকৃতি কিংবা প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের খণ্ডচিত্র গ্রহণ করা হয়। ঘটনাক্রমে, এই জাতীয় জীবন্ত নাট্যধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাসের ১৩টি নাটককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারের নাট্যকৃতির মধ্যে কুড়িআট্টম ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হয়। তারপর থেকে এই নাট্যকারের কাছ থেকে প্রভূত জিনিস গ্রহণ করা হয়েছে। এসব নাটক কুড়িআট্টম মঞ্চউপস্থাপনার বিষয়বস্তু হলেও এখন সমসাময়িক বিভিন্ন থিয়েটার গ্রুপ মঞ্চেও উপস্থাপন করছে। শুধুমাত্র কুঠামবালমে (কেরালার বিভিন্ন মন্দিরে অবস্থিত নৃত্যশালা) কুড়িআট্টম মঞ্চায়ন হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে বিজড়িত। মঞ্চের সম্মুখভাগে একটি প্রদীপ স্থাপন করা হয়। মঞ্চ উপস্থাপনার সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলন, উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের ওপর শান্তিজল বর্ষণ এবং জলদগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রধান চরিত্রাভিনেতার মঞ্চে প্রবেশ ও অভিনয়ের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে। একটি হস্তচালিত পর্দার পেছনে একজন অভিনেতার কিছু অঙ্গ সঞ্চালনও দর্শকদের চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এভাবে সামনের সারির দর্শকদের কাছ থেকে কিছু ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান গোপন করা এ শিল্পের কিছু পবিত্র অঙ্গ।

এ নাট্য-উপস্থাপনার অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে *নির্বাহন*, নাটকের সূচনার বর্ণনামূলক অংশ। একজন অভিনেতা ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে নাটকের কুশীলবদের অতীত জীবনের ঘটনাবলী ও অবস্থার সূত্র ধরিয়ে দেন। মঞ্চে একটি নাট্যঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। কুড়িআট্টমের প্রধান বাদ্যযন্ত্রটি হচ্ছে *মিঝাবু*। মিঝাবু হচ্ছে লম্বা গোলাকার তামার ঢোলকবিশেষ। দু'জন মিঝাবু বাদ্যকার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাতে ঢোলে চাটি মেরে বিভিন্ন বোল ফুটিয়ে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেন। এর সঙ্গে থাকে *এডাক্কা*। এডাক্কা হচ্ছে

নিচে বামে: কুড়িআট্টমের প্রধান কুশীলব রাবণবেশী মার্গি মধু চোকিয়ার ॥ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐহিত্যের স্বীকৃতি কুড়িআট্টমের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করেছে

ঘড়ি-আকৃতির ড্রাম যা ছোট ধাতব কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। কুড়িআট্টমের স্বরপ্রক্ষেপ কৌশল অতীব উচ্চাঙ্গের– সুগম্ভীর সুললিত মন্ত্রোচ্চারণ অনায়াস নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি করে।

কুড়িআট্টমের ঐতিহ্য প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো বলে ধারণা করা হয়। তবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় হাজার বছর আগেকার। নবম শতাব্দীতে চের রাজবংশের কুলশেখর বর্মণের শাসনামলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কুড়িআট্টম পুনর্জীবন লাভ করে। তিনি এতে নতুন মাত্রা যোগ করেন। নাটকের শুরুতে একজন বিদূষক স্থানীয় মালয়ালম ভাষায় রাজাকে ব্যঙ্গ করে সমসাময়িক নানা সামাজিক ঘটনার সরস বক্তব্য প্রদান করেন। এই ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক মন্তব্য এবং স্থানীয় ভাষা ব্যবহার এ নাট্যমঞ্চায়নে এক নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

তবু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কুড়িআট্টম সাধারণ মানুষের কাছে অতি সামান্যই পরিচিত ছিল। এ সময় যে-সব গুণী মানুষের হস্তক্ষেপে এটি বিকাশলাভ করে তাদের মধ্যে মণিমাধব চোকিয়ার, আম্মাবুর মাধব চোকিয়ার এবং পাইনকুলম রাম চোকিয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাজের মাধ্যমে এই নাট্যধারাটি মন্দিরের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে আসে, এমনকি দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করে।

কুড়িআট্টম সাধারণত কয়েক রাত ধরে

অভিনীত হয়, কোন কোন নাটক এমনকি মাসাধিককালব্যাপী স্থায়ী হয়। উচ্চাঙ্গের মুকাভিনয় এবং অভিনেতার অভিনয়-কুশলতার ওপর নাটকের দৈর্ঘ্য ও অভিনয়কাল নির্ভর করে। এখন অভিনয়কে দীর্ঘায়িত না করে শুধু নাট্যমুহূর্ত উপস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে দর্শক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটক বা নাট্যাংশের স্বাদ উপভোগ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ নাঙ্গিয়ার কুঠুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি নাম্বিয়ার মেয়েদের উপস্থাপিত একটি নাট্যকলা। এটি কুড়িআট্টম নাট্য উপস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা হোক, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অদ্যাবধি নাঙ্গিয়ার কুঠুই বারবার একমাত্র উপস্থাপনা হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং কলাকুশলীরা দ্রৌপদী, সীতা ও পার্বতীর মত নারীচরিত্র ফুটিয়ে তুলছেন। সর্বজনবিদিত নাঙ্গিয়ার কুঠু শিল্পীদের মধ্যে ঊষা নাঙ্গিয়ার, ইন্দুজি এবং কপিলা বেনুর নাম উল্লেখযোগ্য। কুড়িআট্টম হচ্ছে ভারতের গুটিকয় উপস্থাপনাশৈলীর অন্যতম যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতিলাভ করেছে, এহেন স্বীকৃতি কুড়িআট্টমের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করেছে।

অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

সূত্র **ইন্ডিয়া পারস্পেকটিভ**
জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা ২০১৮

ছোটগল্প

মতিজানের মেয়ে

রফিকুর রশীদ

আমাদের গ্রামে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

অতি সাধারণ গ্রাম। পাশেই একফালি নদী। নাম তার কাজলা। ওই নামটুকুই আছে। প্রকৃতপক্ষে নদীচরিত্র খুইয়ে বসেছে সেই কবে! গ্রাম্যবৃদ্ধার বুকের ওপরে আলগোছে পড়ে থাকা শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচলের মত যেন-বা। ওইটুকু আঁচল থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী! আমাদের কাজলার হয়েছে সেই দশা। বুকে নেই পানির হদিস, তরঙ্গ উচ্ছ্বাস সে পাবে কোথায়? তা সেই কাজলাপাড়ের গ্রামের মানুষের যে সামাজিক জীবন, অম্লমধুর সেই জীবনও কাজলার মতই নিস্তরঙ্গ।

এখানে নিত্যনতুন এমন কোন ঘটনার ঘনঘটা ঘটে না বললেই চলে, যে ঘটনার তরঙ্গাভিঘাত আরও বহুদিন বহু বছর এই সমাজের বুকে প্রবহমান থাকে, বেগবান থাকে, ফলে সহসা একদিন শ্রাবণের বৃষ্টি ধোয়া এক প্রভাতবেলায় কাজলা পাড়ে পাটক্ষেতের আলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া বিবস্ত্র যুবতীর ক্ষতবিক্ষত শরীর আবিষ্কৃত হলে আমাদের নিস্তরঙ্গ গ্রামটি হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে, ছেলে-বুড়ো সবাই যেন হাতের তেলোয় চোখ রগড়ে ঘুম তাড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করে– এটা কী হল? কে এই মেয়েটি? এখানে তার এই পরিণতি হল কীভাবে?

সূর্যের বৃত্ত থেকে কুসুম ফেটে বেরোতে না বেরোতে এ খবর অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে। কিন্তু আমাদের এই সামান্য গ্রাম আর কতটুকু বড়, কতই-বা লোকসংখ্যা! কাজলাপাড়ের অস্বাভাবিক এবং অসামান্য সংবাদটিকে যথাযথভাবে ধারণ করার জন্য যে মোটেই যথেষ্ট নয় সে কথা বোঝা গেল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের গ্রামের চারদিকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৌতূহলী জনতা আসতেই থাকে কাতারে কাতারে। তাদের চোখেমুখে সে কী উত্তেজনা! মানুষের ভিড়ের মধ্যে কনুইবাজি করে এবং গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে সামনে এগিয়ে যাবার সে কী তীব্র প্রতিযোগিতা! কেউ পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। নগ্ন নারীদেহ বলে কথা। তার আকর্ষণই আলাদা। যারা দেখেছে, তারা তো খোলামেলাই জানাচ্ছে, কাপড়-চোপড় দূরে থাক, সারাদেহে তার একটুকরো সুতো পর্যন্ত নেই।

নানা বয়সের কৌতূহলী মানুষের বিবরণ এই বিপন্ন নারীদেহের বস্ত্রহীনতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও একরকম কথা ছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। অকুস্থলে পৌঁছে দু'চোখের তৃষ্ণা নিবারিত হলে, নাকেমুখে হাত চেপে কাজলার উঁচু পাড় ধরে সবাই ফিরে আসে; কেউ সোজা গিয়ে সদর রাস্তায় ওঠে, পায়ে হেঁটে বা সাইকেল হাঁকিয়ে চলে যায়, কেউ বা রাস্তার পাশে ঝাঁকড়া বটতলায় বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিতে চায়। তবে সবার মুখে আলোচনার বিষয় ওই নারীদেহ। গায়ের রং ফর্সা ধবধবে, এ নিয়ে কোন সংশয় নেই। কেউ কেউ বলে, নিয়ন্ত্রণাধিক রক্তক্ষরণের ফলে ফ্যাকাশে-পাংশুটে হয়ে গেছে। আর কতক্ষণ এ রকম বেহাওলায় পড়ে আছে, তার কি ঠিক আছে!

রক্তক্ষরণ?

বেশ কজন প্রত্যক্ষদর্শী একসঙ্গে চমকে ওঠে। একজন তো বলেই বসে–

কই রক্তপাত তো নজরে পড়েনি!

খুব কাছেই একজন সমর্থন জানায়–

না, না, গলায়-মাথায় কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন তো দেখলাম না! রক্ত-টক্ত আবার কুথায়?

রক্ষক্ষরণের প্রসঙ্গ যে তুলেছিল, সে কোন জবাব না দিয়ে খিকখিক করে হেসে ওঠে। হাসির শব্দে অনেকে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে দেখে অতিদ্রুত সে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাসির লাগাম টানতে চায়; কিন্তু তখনই আবার ফিনকি দিয়ে কলকলিয়ে ওঠে হাসি। বিরক্ত না হয়ে কে থাকতে পারে! কে যেন কড়া গলায় ধমকে ওঠে–

এত হাসির কী হল!

হাসছি কি আর সাধে!

ভয়ানক নির্লজ্জের মত লোকটা আবারও হাসে। হাসির ভাঁজ খুলতে খুলতে অসভ্য ভঙ্গিতে সে বলতেই থাকে–

আমি রক্ত দ্যাখলাম দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে, আর তুমরা গলা-মাথা সব...

কথা শেষ হয় না তার। চমকে ওঠে লোকজন–

তাই নাকি!

এরপর আর কালবিলম্ব ঘটে না। আলোচনার গতিমুখ এক লাফে কুৎসিত বাঁকবদল করে। কথিত রক্তধারা যাদের নজরে পড়েনি তারাও অতি সহজেই যেন নিশ্চিত হয়ে যায়– উপর্যুপরি গণধর্ষণের ফলেই এ রক্তক্ষরণ ঘটেছে। এমন পৈশাচিক ঘটনার খবর অনেকেরই জানা আছে। কেউ কাগজে পড়েছে, কেউ-বা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। কতজনের কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা! সেই সব বিবরণ অতিদ্রুত ডালপালা মেলতে থাকে। সুযোগ বুঝে মূলহীন আলোকলতাও আগ্রাসী ডগা বাড়ায় ফনফনিয়ে। কাজলাপাড়ে পড়ে থাকা স্পন্দনহীন এই নারীদেহটিও কতভাবে লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হতে পারে, কল্পনার রঙ মাখিয়ে তারও বিশদ বিবরণ চলতে থাকে। তখনই আবার চলে আসে তার দেহের বর্ণনা। ঘন লম্বা কেশদাম থেকে শুরু করে হাত-পা, নাক-মুখ, চোখ, এমনকি উদোমবক্ষ– কিছুই বাদ যায় না। বাপরে বাপ, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ছোবল খাওয়া নারীদেহ হলে বুঝি দর্শকের সবগুলো ইন্দ্রিয় এতটাই সজারুসজাগ হয়ে যায়! এতটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সব কিছু! ঠোঁটের নিচে কবেকার সূক্ষ্ম কাটাদাগ, স্তন জোড়ার মাঝখানে উপল ভূমিতে ক্ষুদ্র এক খয়েরি তিল, স্তনবৃন্তের গড়ন কেমন, বামদিকে কাঁধের নিচে কী একটা জরুল অথবা আঁচিল, নাভির নিচে দাদ-খুজলির চাকা– ধীরে ধীরে উঠে আসে সব বিবরণ। এরই মাঝে একজন তো আচানক এক তথ্য জানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। বিবস্ত্র ওই নারীদেহের পায়ের পাতা পর্যন্ত সে নিখুঁতভাবে দেখেছে। খুব গভীর পর্যবেক্ষণ তার। তাই সে জোর দিয়ে জানায়, ওই মহিলার ডান পায়ে আছে ছয়টি আঙুল। পাঁচটির জায়গায় ছয়টি। ফলে তার আঙুলগুলো আদার প্যাঁচের মত জড়িয়ে আছে। একটির গায়ে আরেকটি লেগে আছে নিবিড়ভাবে। তা হবে হয়তো-বা। এতসব সুগভীর পর্যবেক্ষণের যোগফল যা দাঁড়ায় তা থেকে এটুকু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, কাজলাপাড়ে পাটক্ষেতের আইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটি দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী।

মেয়েটির বয়স কত হতে পারে সেটা কিন্তু অনির্ণীতই থেকে যায়। তাকে কি মহিলা বলা চলে? নারী? নাহ্, মেয়েদের বয়স নির্ণয়ের কাজটা মোটেই সহজ নয়। 'সুন্দরী' বলে ঘোষণা দেওয়া যত সহজ, ততটা মোটেই নয়। শৈশব থেকে কৈশোর এমনকি তারুণ্যের বারান্দা পর্যন্ত একরকম; যৌবনের পিচ্ছিল সিঁড়িতে পা দিলেই সামনে অথই সমুদ্দুর, অবাধ সাঁতার; কে তার তড়া পায়, ধরা পায়! কে বলবে বালিকা কবে যুবতী হল, কখন হল মেয়েমানুষ! কাজলাপাড়ের ঘুমন্ত মেয়েটির বস্ত্রহীন উদোম শরীর এতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পরও সবাই একমত হতে পারে না তার বয়সের প্রসঙ্গে এসে। কত হতে পারে তার বয়স– বাইশ? বত্রিশ? বিয়াল্লিশ? কেউ কেউ চোখ কপালে তুলে ভাবতে বসে– অ্যাঁ, বিয়াল্লিশও হতে পারে? কারও কারও শরীরে বাঁধন থাকে বটে, একেবারে গিঁটে গিঁটে অটুট থাকে, বাইরের লাবণ্য দেখে ধরাই যায় না– আদৌ ছেলেপুলে হয়েছে কিনা। স্তনের বিষয়ে অধিক কৌতূহলী লোকটি অনেকক্ষণ বিরতির পর খ্যাক খ্যাক করে হেসে তার বিজ্ঞ অভিমত পেশ করে– আরে ওটা আবার কোন সমস্যা হল? মেয়ে মানুষের বুকের গঠন দেখলেই সব পরিষ্কার। বয়স লুকাবে কোথায়?

বেশ তাহলে যাও, আর একবার ভাল করে দেখে এস উলঙ্গ মেয়েটার বুক। তারপর বল তার বয়স কত?

উপস্থিত অনেকেই চেপে ধরে বিশেষ অভিজ্ঞ সেই লোকটিকে। তখন সে ভীষণ গাঁইগুই শুরু করে। প্রস্তাব অনুযায়ী উলঙ্গ নারীদেহটি পুনর্বার প্রত্যক্ষ করতেও যাওয়া হয় না তার, আবার ভয়ে ভয়ে বয়সের আন্দাজও কিছুতে প্রকাশ করতে পারে না। এমতাবস্থায় মেয়েটির সম্ভাব্য বয়স নিয়ে যে যেমন পারে মন্তব্য করে, এমনকি নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে তর্কও জুড়ে দেয়– না না তিরিশের ওপরে যেতেই পারে না। এদিকে ত্রিশের এপারে যাদের অবস্থান, তারাও পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। অকাট্য প্রমাণ হিসেবে তারা আবারও সেই ক্ষতবিক্ষত নারীদেহের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আবার সেই বুকের বর্ণনা, স্তনবৃন্ত কোনদিকে হেলে পড়েছে কি না, ওই বৃন্তের গোড়ায় খয়েরি বৃত্তের আয়তন কতটা, তলপেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে কিনা– ইত্যাকার পর্যবেক্ষণের ফল ঘুরেফিরে উঠে আসে। কথার পিঠে কথা আসে, কদর্যপূর্ণ তর্কাতর্কি জমে ওঠে, কিন্তু প্রকৃত বয়সের কিনারা হয় না কিছুতেই।

অথচ একথা তো সত্যি– এ বয়সের নারী প্রায় সব বাড়িতেই আছে। আমাদের গ্রামে তো বটেই, সব গ্রামে প্রায় সব ঘরে ঘরে এই বয়সের নারীরাই ঘরের খুঁটি হয়ে সংসারের বোঝা কাঁধে নেয়, ঝড়-ঝাপটা সামলায়, সন্তান লালন-পালন করে, পুরুষের চোখে নতুন স্বপ্নের আলোকলতা ছড়িয়ে দেয়; কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে কাজলাপাড়ে শুয়ে থাকা এই বিবস্ত্র নারীকে কেউ চিনতেই পারে না। আশপাশের গ্রাম থেকে আসা লোকজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, কিন্তু মোটেই শনাক্ত করতে পারে না– মেয়েটি কে? কারও যেন মনেই পড়ে না– আগে কোথাও তাকে দেখেছে কিনা। ঘটনার অকুস্থল যেহেতু আমাদের গ্রামের কাজলাপাড়, তাহলে এ গ্রামের কেউ না কেউ তাকে চিনবে তো! যদি এ গ্রামের মেয়ে হয় তাহলে তো কথাই নেই; এই ধুলোমাটির রাঙাপথ, এই সবুজ মাঠ, বনবনানী, এই যে উঠোনের কোণে কলাগাছের ঝাড়, গোধূলিবেলায় ঘরেফেরা পাখির ঝাঁক– এই সবই তার আশৈশবের চেনা। এমন দুঃসময়ে তাকে কেউ চিনবে না? গ্রামের মানুষ কি এত সহজে চোখের পর্দা উল্টে ফেলতে পারে? তাই সম্ভব? এ গ্রামের মেয়ে না হয়ে যদি কারও বাড়ির বউ হয়, তাতেই-বা কী আসে যায়! বউয়ের আব্রু-ইজ্জত রক্ষার কথা কেউ ভাববে না! উদোম আকাশের নিচে পড়ে আছে মেয়েটির বস্ত্রহীন দেহ, এ দৃশ্য কাউকে একটুখানি লজ্জিতও করে না? ইউপি চেয়ারম্যান মোটরসাইকেল ভটভটিয়ে এসে কাজলাপাড়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নগ্ন নারীর সৌন্দর্য-সুধায় মগ্ন হয়ে থাকে, এক সময় কেরামত মেম্বার এসে ধ্যানভঙ্গ ঘটায়– ইর আবার পোস্টমর্টেম লাগবে নাকি চিয়ারম্যান সাব?

চেয়ারম্যান সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে প্রথমে ন্যাটা চৌকিদারের খোঁজ করে। গ্রামে এত বড় ঘটনা ঘটে যাবার পরও গ্রাম্য চৌকিদারের কোন ভূমিকা থাকবে না এটা তো হয় না। নাকেমুখে ন্যাকড়া চেপে ন্যাটা চৌকিদার হাজির হলে তাকে পাঠায় থানা পুলিশের কাছে। তারপর কেরামত মেম্বারের কাঁধে হাত রেখে চেয়ারম্যান গুরুগম্ভীর মুখে বলে– আন-ন্যাচারাল ডেথ। দেখা যাক কী করা যায়!

মোটরসাইকেলের সিটে পাছা ঠেকিয়ে পায়ে কিক কষতে গিয়েও কী মনে করে চেয়ারম্যান দাঁড়িয়ে পড়ে, মেম্বারকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে–

মেয়েটি কে বল দেখি!

কেরামত মেম্বার চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। যেন এমন প্রশ্ন সে কস্মিনকালেও শোনেনি। কী ভেবে প্রায় অকারণে ফিক করে সে হেসে ওঠে। চেয়ারম্যান সে হাসিকে গুরুত্ব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে– কার বউ ওটা?

এ প্রশ্ন তো নতুন কিছু নয়! সেই ভোরবেলা থেকেই দর্শকরা খাবি খাচ্ছে এই প্রশ্নে– কার বউ ওটা? কিংবা কার মেয়ে? বেশ ক'জন অতিউৎসাহী মানুষ একবারের জায়গায় দু'তিনবারও ছুটে গেছে সেই বিবস্ত্র নারীর কাছে, ভিড় ঠেলে তার মাছি ভনভনানো মুখের কাছে মুখ নামিয়ে চিনতে চেষ্টা করেছে, দু'একজন আবার ভুল শনাক্তের জন্য দাঁতে জিভ কেটে পিছিয়ে এসেছে। নাহ সঠিক পরিচয় কেউ নির্ণয় করতে পারেনি। এ গ্রামে এমন চেহারা আগে কখনও কেউ দেখেনি। তাহলে অচেনা এই মেয়েটি এখানে এল কোত্থেকে? কারা নিয়ে এল? কোন পিশাচের দল? এসব প্রশ্নের কোন কিনারাই হয়নি এ নাগাদ। প্রশ্নের পিঠে শুধু প্রশ্নই উঠেছে, ভুল শনাক্তের সূত্র ধরে কখনও-বা কুৎসিত বিতর্কও জমে উঠেছে, সমাধান কিছুই হয়নি। অবশেষে সবাই ধরে নিয়েছে– এমন ঘটনা তো এখন হরহামেশা ঘটেই চলেছে, কতটুকুই-বা অস্বাভাবিক এমন!

অনেক বিলম্বে হলেও চেয়ারম্যানের মুখে সেই পুরনো প্রশ্ন শুনে অনেকেই আবার নতুন করে ভাবতে বসে– তাই তো, এ গ্রামের হোক বা না হোক, মেয়েটির কোন পরিচয়ই জানা যাবে না! শতেক কাজে ব্যস্ত চেয়ারম্যান মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে চলে যাবার পরও উপস্থিত অনেকের চোখেমুখে ওই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসাচিহ্নের আকৃতি নিয়ে তা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে– একটা মানুষকে তাহলে চেনাই যাবে না? প্রশ্নটি ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ এক ঘূর্ণাবর্তে এসে পাক খায়। চেনা-অচেনা যাই হোক, মৃতদেহের শেষকৃত্য বলেও কি কিছুই হবে না?

বেলা গড়িয়ে পড়ে পশ্চিমে। মানুষের ভিড় খানিকটা হালকা হয়ে এলেও অনেকের মাথায় শেষ প্রশ্নটি উৎকট হয়ে ঠোকা মারে– একটা মানুষের মরদেহ স্রেফ শেয়াল-কুকুরের পেটে যাবে? শেষকৃত্যের প্রশ্নে সাংঘাতিক এক গিঁট পথ আগলে দাঁড়ায়– মেয়েটি হিন্দু না মুসলমান সেটুকু তো অন্তত জানতে হবে! শহরে অশনাক্তযোগ্য লাশের ক্ষেত্রে আঞ্জুমান মফিদুল যাই করুক কাজলাপাড়ের এই গ্রামে সে সব হ্যাপা কে সামলায়! এদিকে শ্রাবণ আকাশ নত হয়ে আসছে কালো মেঘে। কখন যে বরিষণ ধারা ঢালতে শুরু করে তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে!

দুই.

পরদিন প্রভাতবেলায় আমাদের গ্রামের বাঁশবাগানে আবার শোনা যায় পাখির কাকলি, গাছে আবার ফুল ফোটে, অন্ধকারের পর্দা চিরে আবারও হেসে ওঠে আলোকের ঝর্নাধারা। কী যে খেয়ালি প্রকৃতি– সারারাত অঝোরধারায় বৃষ্টি ঢালার পর কে জানত সকাল হতে না হতে এমন আলো ঝলমলে আকাশের শামিয়ানা মেলে ধরবে! আর এদিকে কেমন অবাক কাণ্ড দেখো– কাজলাপাড়ে এসে সেই আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একাব্বরের মা মতিজান বেওয়া। আলিঝালি বিধবা। মাসখানেকেরও অধিক হয়ে গেল সে গ্রামে নেই, ছেলেমেয়ের সন্ধানে গেছে ঢাকায়। একাব্বরের সন্ধান মিলেছে। দুর্ঘটনা তাদের গার্মেন্টসে নয়। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে একাব্বরের ছোটবোন কুলসুম এবং তার স্বামী যেখানে কাজ করে সেইখানে। সেই গার্মেন্টসে। কত মানুষ যে সেই ধ্বংসস্তূপে মারা পড়েছে, তার কোন সঠিক লেখাজোখা নেই। এ সব গা-শিউরানো খবর শুনে কোন পাষাণী মা স্থির হয়ে বাড়িতে বসে থাকতে পারে? ঢাকা নগরী সে চেনে না, তবু ছেলেমেয়ের দুটো মোবাইল নম্বরের ওপরে ভরসা করে একদিন গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ঢাকার উদ্দেশে।

একাব্বরের মায়ের গ্রামে ফেরার কথা তো কেউ শোনেনি। বাদলা মাথায় সে এই কাজলাপাড়েই-বা কখন এল, কীভাবে এল? সে-ই কি সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বিবস্ত্র এই মেয়েটিকে আগলে রেখেছে? না, এই মুহূর্তে একেবারে আক্ষরিক অর্থে বিবস্ত্র আর বলা চলে না। মতিজান বেওয়া নিজের বুকের আঁচল টেনে বিছিয়ে দিয়েছে অচেনা মেয়েটির বুকের জমিনে। তার দেহের নিম্নাংশ তখনও আগের মতই অনাবৃত। তা নিয়ে মতিজান বড়ই বিব্রত, সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত। সাতসকালে সমবেত কৌতূহলী যুবকদের মধ্যে কাকে যেন হাত ইশারায় ডেকে সে বলে– কাপড়-চোপড় একটা কিছু আনি দেনা বাপ, আমার মেয়িডার গা'র ওপরে দেব।

মতিজানের মেয়ে? চমকে উঠে সকলে। চোখ রগড়ে ভাল করে তাকায়। মতিজানের মেয়ে মানে তো সেই কুলছুম! মাথা খারাপ! এই গ্রামে জন্ম, এই ধুলোমাটিতে বেড়ে ওঠা কুলছুমকে এ গ্রামের লোকজন চিনবে না? তার কোন খবরই জানবে না? বললেই হল! আত্মীয়তার সম্পর্ক থাক বা না থাক, গ্রামের মানুষের ওপরে টান থাকবে না? কেউ কারও খোঁজখবর রাখবে না, তাই হয়! ঢাকায় রানা প্লাজার ধ্বংসলীলার খবর নিয়ে যখন সারা দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়, তখন তো এ গ্রামের লোকজন হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। একাব্বরসহ আরও যে দু'চারজনের মোবাইল নম্বর জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা, খবরাখবর সংগ্রহ করা– সাধ্যমত সবই করেছে গ্রামের মানুষ। কী করেনি? ছেলেমেয়ের চিন্তায় উন্মাদিনীপ্রায় মতিজান বেওয়াকেও একদিন তারা ঢাকার কোচে উঠিয়ে দিয়েছে।

সেই মানুষ সবার অলক্ষ্যে ঢাকা থেকে ফিরে এসে সহসা এ রকম নাটক করলে সবাই মানবে কেন? গ্রামের লোকজন কি ঢাকার খোঁজখবর কিছুই রাখে না? পাশের গ্রামের শেফালি হাত-পা থেঁতলে আধমরা হয়ে বাড়ি ফিরেছে, তাকে দেখতে যায়নি তারা? একাব্বরের খবরও পেয়েছে। সে ভালই আছে। মারা গেছে কুলছুমের স্বামী। হাইস্কুল মাঠের পচাগলা লাশের সারি থেকে তার মৃতদেহ নাকি শনাক্ত করাও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু নানাবিধ বাস্তব অসুবিধার কারণে সেই লাশ বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনতে পারেনি। সেই লাশ দাফন-কাফন হয়েছে সরকারি তত্ত্বাবধানে। আর এই কুলছুমের কোন খবর নেই, জীবিত বা মৃত কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। কুলছুমের মা মতিজান কিছুতেই প্রবোধ মানছে না, দিনরাত রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপের সামনে মাথা কুটছে। গ্রামে এইসব খবরই এসে পৌঁছেছে। কৌতূহলী সবাই সে-সব জানেও। ময়-মুরুব্বিদের মধ্যে কেউ কেউ মতিজান বেওয়ার জন্য জিভ চুকচুক করে আফসোসও করেছে– বেচারা এইবার বোধহয় পাগলই হয়ে যাবে। কুলছুম যে তার জানের টুকরো! তাকে ছাড়া বাঁচবে কী করে!

প্রশ্নটা যেহেতু বাঁচা-মরার, তাহলে ব্যাপার মোটেই সামান্য নয় সেটা ঠিক; হয়তো সংকট আছে আরও গভীরে। কিন্তু তাই বলে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেই গ্রামবাসীকে এ রকম এক নাটকের মুখোমুখি হতে হবে, সে কথা কে ভাবতে পেরেছে! দৃশ্যটি বেশ নাটকীয় বটে। সন্তানহারা এক শোকবিহ্বল মা বসে আছে আলুথালু, দৃষ্টি তার ভাবলেশহীন, মৃতকন্যার মাথা তার কোলে, নিজের বুকের আঁচল দিয়ে সন্তানের আব্রু রক্ষার সবিশেষ প্রচেষ্টা– একে মানুষ নাটকীয় বলবে না?

বেলা বাড়তে বাড়তে কাজলাপাড়ের জমায়েতে লোকসংখ্যাও বাড়তে থাকে। নানাজন এসে নানান প্রশ্নে জেরবার করে মতিজানকে। সবাই মিলে নানান যুক্তিতে বোঝাতে চেষ্টা করে– কাল থেকে বেআব্রু পড়ে থাকা এই মৃতদেহটি কিছুতেই তার কন্যা কুলছুমের নয়। কুলছুমকে তারা আশৈশব বেশ ভাল করেই চেনে, এ কুলছুম নয়।

কে শোনে কার কথা!

একেবারে সহজ-সরল যুক্তি মতিজান বেওয়ার– দশ মাস পেটে ধরেছি আমি, বুকের দুধ খাওয়েছি আমি, বাপের অভাব কখনও বুঝতে দিইনি, আমিই বাপ, আমিই মা; আর আমি কিনা আমার মেয়িকে চিনবু না! পর্বত-প্রমাণ অটল সিদ্ধান্ত তার। সমাজের মণ্ডল-মাতুব্বর, মেম্বার, চেয়ারম্যান, মসজিদের ইমাম গুছিয়ে একত্রিত হলে সে সবার মুখের ওপরে অনতিক্রম্য এক প্রশ্ন ছুড়ে দেয়– আমার মেয়ির জানাজা হবে না?

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে সবার দৃষ্টি এসে পড়ে ইমাম সাহেবের দিকে। গতকাল তিনি ওই বেপর্দা নারীর ধর্মপরিচয় জানতে চেয়েছিলেন– হিন্দু না মুসলমান! সন্তানের প্রতি মায়ের স্বীকৃতি ঘোষণার পর সেই প্রশ্নটি হয়ে ওঠে অবান্তর। বরং মতিজানের প্রশ্নটি কানে কানে আছড়ে পড়ে– জানাজা হবে না? ইমাম সাহেবের ভয় হয়, উত্তর দিতে দেরি হলে মতিজান যদি হঠাৎ হা-হা করে হেসে ওঠে!

রফিকুর রশীদ শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য, কবির এক সময়ের আপ্ত সহকারি, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের প্রখ্যাত প্রফেসর, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ও 'সংখ্যা' সাময়িকীর প্রকাশক-সম্পাদক, প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মের একশ পঁচিশতম বছরে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

তপন চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের খণ্ডকালীন প্রফেসর, প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের স্থায়ী প্রফেসর ও স্বাধীন ভারতের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পূর্ব পুরুষ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ কলকাতায় আসেন এবং একটি ওষুধের দোকান দেন। গুরুচরণ সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শ অনুসরণে বিধবা বিবাহ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গুরুচরণ মহলানবিশের গভীর সখ্য ছিল। উভয়ে মিলে ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অফিস গুরুচরণের ২১০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাসভবন। গুরুচরণ সমিতির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গুরুচরণের জ্যেষ্ঠ ছেলে সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন। তিনি লন্ডনের এডিনব্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিওলজিতে (শারীরস্থানবিদ্যা) ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি এডিনব্রা রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদও লাভ করেন। তিনি কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিওলজি বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ রাজত্বে লন্ডনের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পদে বসতে পেরেছিলেন। পরে তিনি ভারতে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিওলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিভাগে প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সদস্য পদেও বৃত হন। গুরুচরণের কনিষ্ঠ সন্তান প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশও কর্নওয়ালিশের বাসায় জন্মেছিলেন। মহলানবিশ পরিবার পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকায় প্রশান্তচন্দ্র বহু মনীষীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পিতা প্রবোধচন্দ্র ও মাতা নিরোধবাসিনী। ১৮৯১ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। নিরোধবাসিনী নন্দলাল সরকারের কন্যা। নিরোধবাসিনীর ভাই বিখ্যাত ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার। যাঁর নামে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নন্দলাল সরকারও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

১৮৯৩ সালের ২৯ জুন প্রশান্তচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে ব্রাহ্মদের পরিচালিত স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯০৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১০ সালে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯১২ সালে বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯১৩ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার লক্ষ্যে লন্ডন গমন করেন।

ছোটকাল থেকে প্রশান্তচন্দ্র যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি যে কোন বিষয়কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি পরিশীলিত মনন ও নির্মল সংস্কৃতির চর্চা করতেন। যে কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্র যখন লন্ডন পৌঁছান তখন গ্রীষ্মকাল। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় আরও পরে দেখে তিনি ক্যাম্ব্রিজ যান। ক্যাম্ব্রিজ থেকে ফেরার সময় তিনি ট্রেন ফেল করে এক বন্ধুর বাসায় রাত কাটান। সেখানে তিনি কিংস কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই ছাত্রের কাছে কিংস কলেজের সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন এবং কিংস কলেজে ভর্তি হওয়ার সংকল্প পোষণ করেন। কিংস কলেজ দেখে তিনি অভিভূত হন এবং সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় বসেন। তিনি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি।

কিংস কলেজ থেকেই ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পাশ করেন। এই কলেজেই ১৯১৪ সালে তিনি অংকে পার্ট ওয়ানে ট্রাইপস পাশ করেন। এর পর তিনি পাঠ পরিবর্তন করে প্রকৃতি বিজ্ঞানের ট্রাইপস-এ ভর্তি হন। প্রকৃতি বিজ্ঞানে ১৯১৫ সালে পার্ট টু-তে প্রথম শ্রেণিতে পাশ করেন। এই সময় কিংস কলেজ তাঁকে সিনিয়র স্কলারশিপ প্রদান করে। ক্যামব্রিজে থাকাকালে তাঁর সঙ্গে মহান প্রতিভাধর অঙ্কশাস্ত্রবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের ট্রাইপস মহলানবিশ পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং ক্যাভেনডিস ল্যাবোরেটরিতে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেন। তিনি ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে গবেষণা প্রকল্প শুরুর পূর্বে তিনি স্বল্পদিনের জন্য অবকাশ যাপন করেন। তাঁর কাকা প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিওলজির প্রফেসর সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ প্রশান্তচন্দ্রকে কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচিত করান। অধ্যক্ষ সেই সময়ে তাঁর কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে শূন্য পদের বিপরীতে স্বল্প মেয়াদে অধ্যাপনার জন্য পাত্র খুঁজছিলেন। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর তখন যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মহলানবিশ সম্মত হন। তবে তাঁর ইচ্ছা স্বল্পমেয়াদী অধ্যাপনা শেষে তিনি ক্যামব্রিজ ফিরে প্রারব্ধ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করবেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে এত নিবিষ্ট হলেন যে, ক্যামব্রিজে ফেরার পরিকল্পনা বর্জন করেন। পরিকল্পনা ত্যাগের পেছনে অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে গিয়ে আকস্মিক ট্রেন ফেল করার কারণে যেমন তিনি কিংস কলেজের প্রতি আকর্ষিত হন, তেমনি পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপনা করতে গিয়ে তিনি স্ট্যাটিস্টিকস বা পরিসংখ্যানতত্ত্ব বা সংখ্যাতত্ত্বের প্রতি হঠাৎ আকর্ষণ বোধ করেন। প্রশান্তচন্দ্র দেশে ফেরার জন্য জাহাজের অপেক্ষায় ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় সঙ্গত কারণে কিছুই ঠিকমত চলছিল না। এই অবসরে প্রশান্তচন্দ্র কিংস কলেজের গ্রন্থাগারে সময় কাটাতেন। গ্রন্থাগারে তিনি কয়েক ভল্যুম 'বায়োমেট্রিকা' দেখতে পান এবং সেইগুলো আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। বায়োমেট্রিকার সম্পাদকের নাম কার্ল পার্সন। তিনি সঙ্গে করে 'বায়োমেট্রিকা'র ভল্যুমগুলোর পুরো সেট নিয়ে এসেছিলেন। জাহাজে বসে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে বায়োমেট্রিকা পাঠ করেন। কলকাতায় আসার পরও অধ্যাপনার ফাঁকে তাঁর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। তিনি পরিসংখ্যানতত্ত্বকে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি শাখা বলে গণ্য করেন। এই বিজ্ঞান পরিমাপ নির্ধারণ ও অন্যান্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিদ্যাকে ব্যাপক কাজে লাগানোর সম্ভাবনা তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁর এই বিদ্যা প্রয়োগের জন্য তিনি ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আবহবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে সমস্যা সমাধানের অনন্য সুযোগ লাভ করেন। তিনি এই সব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই ঘটনা তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

পরিসংখ্যানতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা থেকে বিচ্যুত করেনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৯২২ সালে তাঁকে প্রফেসর পদে বৃত করেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় আরও ত্রিশ বছর রত থাকেন। এই সময়ের মধ্যে পরিসংখ্যানতত্ত্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন এবং ভারতে বিজ্ঞানের এই শাখার অভূতপূর্ব বিকাশসাধন করেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারের এক অংশে পরিসংখ্যানতত্ত্ব গবেষণার ব্যবস্থা করেন। এটিই ছিল ভবিষ্যতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের সূতিকাগার।

প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯২৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা নির্মলাকুমারীকে বিয়ে করেন। নির্মলাকুমারীর পরিবারও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে দুই ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে অনৈক্য ছিল। যে কারণে প্রশান্তচন্দ্রের পিতা সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বিয়েতে সায় দেননি। তাঁর অমতে মামা স্যার ডাঃ নীলরতন সরকারের উপস্থিতিতে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে আবহবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের সুযোগ পেয়েছিলেন ও এসবের উপর গবেষণা করছিলেন। এর সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করার অনুরোধ পেয়েছিলেন। প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯২০ সালে ভারতের নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সেই সময় জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর বিজ্ঞানীকে কলকাতার নানাভাবে মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে স্বতন্ত্র সংখ্যা নিরূপণের অনুরোধ জানান। প্রশান্তচন্দ্র সমীক্ষা করে Anthropological observations on the Anglo-Indians of Calcutta I Analysis of male stature (১৯২২) গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই গবেষণাপত্র দেখে ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মেটিরিওলজি আবহবিজ্ঞানের কিছু সমস্যা সমাধানে মহলানবিশকে অনুরোধ করেছিলেন। বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করেন এবং তিনটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। গবেষণাপত্র তিনটির শিরোনাম হল: On the seat of activity in the upper air (1923); On errors of observation and upper air relationships (1923); and Correlation of upper air variables (1923)। এ-সব গবেষণাপত্র MathSciNet-এ (আমেরিকার ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র। ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তাদের প্রকাশিত মুখপত্রে ১৯৪০ সাল থেকে অঙ্কশাস্ত্রের উপর প্রকাশিত গবেষণাপত্র ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়) প্রকাশিত হয়। MathSciNet-এ ১৪৪টি গবেষণাপত্রের মধ্যে মহলানবিশের গবেষণাপত্রগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় এবং মুখপত্রে এ-সবের উপর সমৃদ্ধ আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আবিষ্কৃত পরিসংখ্যান পদ্ধতি মহলানবিশ ডিসট্যান্স (Mahalanobis distance ev D2 statistic) নামে পরিচিত। এটি একটি জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়া যা সাধারণের বোধগম্য নয়। তিনি এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৩ সালে Statistical note on the significant character of local variation in proportion of dextral and sinistral shells in

samples of the snail শিরোনামের একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি ২শ'র বেশি গবেষণাপত্র রচনা করেছেন এবং তা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এ-সব গবেষণাপত্রে কৃষি থেকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের চা-পানের অভ্যাসসহ বহু বিষয় স্থান পেয়েছিল।

গবেষণাপত্র প্রকাশ ছাড়া প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠা এবং কার্ল পার্সনের অনুকরণে 'সংখ্যা' সাময়িকী প্রকাশ। বলেছিলাম প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের এক কোণে পরিসংখ্যানতত্ত্ব গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন এই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে এস এস বোস, জে এম সেনগুপ্ত, রাজচন্দ্র বোস (ভারতীয় বংশোদ্ভূত অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যানবিদ), সমরেন্দ্রনাথ রায় (ভারতীয়-আমেরিকান অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও ফলিত পরিসংখ্যানবিদ), কে আর নায়ার, রঘুরাজ বাহাদুর, গোপীনাথ কল্যাণপুর (ভারতীয়-আমেরিকান অঙ্ক ও পরিসংখ্যানবিদ এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রথম পরিচালক), ডি বি লাহিড়ী, সি আর রাও (ভারতীয়-আমেরিকান অঙ্ক ও পরিসংখ্যানবিদ) ছিলেন। তবে এই সব অনানুষ্ঠানিকভাবেই চলছিল। পরে ১৯৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর প্রমথনাথ ব্যানার্জি, ফলিত অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের প্রফেসর নিখিলরঞ্জন সেন ও ভারতীয় শিল্পপতি রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রমুখ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিকস্' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তখনকার মত তা প্রফেসর মহলানবিশের কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। প্রকৃত পক্ষে, মহলানবিশই মূলত ১৯২০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত অসামান্য শ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনের ৩১ নম্বর ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৩২ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে নিবন্ধিত করা হয়।

প্রতিষ্ঠার পর প্রফেসর মহলানবিশ এর পরিচালক ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ইনস্টিটিউটে লোকশক্তি নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ১৯৩২ সালে তিনি আর সি. বোসকে পার্ট-টাইম চাকরি করার অনুরোধ জানান। শর্ত ছিল, সারা বছর প্রতি শনিবারে এবং গ্রীষ্মে ও পূজার ছুটিতে তিনি পুরো সময় কাজ করবেন। তাঁর কিছুদিন পর সমরেন্দ্রনাথ রায়কেও পার্ট-টাইম চাকরিতে নিয়োগ করা হয়। মহলানবিশ মি. বোসকে পড়ার জন্য গবেষণাপত্রের একটি তালিকা দিয়েছিলেন। তিনি গবেষণাপত্র পাঠ করেন এবং তা প্রয়োগ করে বিশ্বমানের পরিসংখ্যানবিদে পরিণত হয়েছিলেন। ইনস্টিটিউটে প্রথমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সি আর রাও এখানে এক বছর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তিনি গবেষণা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট-এর নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ১৯৪৩ সালে এর টেকনিক্যাল শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্তি পান। পরে তিনি বিশ্ববিশ্রুত পরিসংখ্যানতত্ত্ববিদে পরিণত হন।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ইনস্টিটিউটকে বড় অনুদান প্রদান করেন। অনুদানের অর্থ দিয়ে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবন ও সাজ-সরঞ্জাম এবং প্রফেসর, সহকারি প্রফেসর নিয়োগের পরামর্শ দেন। এই অনুদান অনুমোদনের পেছনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক শ্রীপিতাম্বর পন্থের ভূমিকা ছিল।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের কর্মপরিধি প্রসারিত হয়। ১৯৫০ সালে ২০৩ নম্বর বি টি রোডে চার একর জায়গা কেনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়। ব্রিটেনের পরিসংখ্যানতত্ত্ববিদ ও বংশগতিবিজ্ঞানী স্যার আর এ ফিশার ১৯৫১ সালে প্রধান ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কাজও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এখানে স্থানান্তর করা হয়।

ভারত সরকার ১৯৫৯ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অ্যাক্ট বিল পাশ করেন। অ্যাক্ট ইনস্টিটিউটকে পরিসংখ্যানতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, অর্থনীতি ও কম্প্যুটার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি দানের ক্ষমতা দেয়। এ ছাড়া পরিসংখ্যানতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও প্রবর্তন করতে পারবে বলে জানায়। এই ইনস্টিটিউট থেকে মহলানবিশের সম্পাদনায় ১৯৩৩ সালে 'সংখ্যা' সাময়িকীর প্রকাশ শুরু হয়েছিল। এটি পরিসংখ্যানতত্ত্বের উপর আন্তর্জাতিক মানের সাময়িকীর মর্যাদা অর্জন করে।

প্রফেসর বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে নানা পদে কর্মরত ছিলেন। তখন তরুণ অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর কনিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মোতাহার হোসেনের মধ্যে প্রতিভার দ্যুতি লক্ষ করেন। তিনি তাঁকে ভালবাসতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিদেশ যাওয়ার আগে ১৯২২ সালে কাজী মোতাহার হোসেনকে নিয়ে কলকাতায় যান এবং মহলানবিশের হাতে তুলে দিয়ে আসেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁর স্ত্রী নির্মলাকুমারী মোতাহার হোসেনকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। মোতাহার হোসেন তাঁদের বাবা-মা ডাকতেন। প্রশান্তচন্দ্র অত্যন্ত যত্নসহকারে মোতাহার হোসেনকে বিশেষ পরিসংখ্যানতত্ত্ববিদ হিসেবে গড়ে তোলেন। মোতাহার হেসেন পরিসংখ্যানতত্ত্বে ডিপ্লোমা পাশ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। পরিসংখ্যানতত্ত্বে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সুপারিশে ও বিজ্ঞানী রোনাল্ড ফিশারের অনুমোদনে মোতাহার হোসেনকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তাঁর উদ্ভাবিত পরিসংখ্যান পদ্ধতির শিরোনাম 'হোসেন চেইন রুল' নামে বিখ্যাত। কাজী ড. মোতাহার হোসেন পূর্ববঙ্গে ১৯৫০ সালে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্ব বিভগের পত্তন ঘটান।

প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর গবেষণার জন্য বহু পুরস্কার অর্জন করেন:

- ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সের ফেলো।
- ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স একাডেমির ফেলো।
- ১৯৪২ সালে অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এমপায়ার।
- ১৯৪৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়েলডন' মেডেল (চেক বংশোদ্ভূত জার্মান বংশগতি বিজ্ঞানী গ্রেগর যোহান মেন্ডেলের নামে প্রবর্তিত)।
- ১৯৪৫ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো।
- ১৯৫০ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি।
- ১৯৫১ সালে আমেরিকার ইকোনোমিক সোসাইটির ফেলো।
- ১৯৫২ সালে পাকিস্তান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো।
- ১৯৫৪ সালে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির সাম্মানিক ফেলো।
- ১৯৫৭ সালে স্যার দেবীপ্রসাদ সর্বাধিকারী গোল্ড মেডেল
- ১৯৫৮ সালে রাশিয়ার একাডেমি অফ সায়েন্সেসের বৈদেশিক সদস্য।
- ১৯৫৯ সালে কিংস কলেজ, ক্যামব্রিজের সাম্মানিক ফেলো।
- ১৯৬১ সালে আমেরিকার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো।
- ১৯৬৪ সালে চেক একাডেমি অফ সায়েন্সেসের গোল্ড মেডেল।
- ১৯৬৮ সালে তাঁকে শ্রীনিবাস রামানুজন মেডেল প্রদান করা হয়।
- ১৯৬৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির দুর্গাপ্রসাদ খৈতান গোল্ড মেডেল।
- ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের পদ্মবিভূষণ।

বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছাত্র ও সহকর্মী সি আর রাও লিখেছিলেন, 'ভারতের সর্বজনবিদিত প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কলকাতায় তাঁর উদরের অপারেশনের তিন সপ্তাহ পরে ১৯৭২ সালের ২৮ জুন প্রয়াত হন। ২৯ জুন ছিল তাঁর জন্মদিন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি গবেষণায় রত ছিলেন। তখনও তিনি ইনস্টিটিউটের সাম্মানিক সম্পাদক ও পরিচালক এবং ভারত সরকারের পরিসংখ্যানতত্ত্ববিষয়ক সাম্মানিক উপদেষ্টা। বিশ শতকের সূচনালগ্নে মহলানবিশযুগের শুরু এবং বিশ শতকের সাতের দশকে সেই যুগের অবসান হল। পরিসংখ্যানতত্ত্বে ভারতের এই স্বর্ণযুগকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্মরণে রাখবে। এই সময়ে মানবকল্যাণে নবতর প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিকাশ ও সফল প্রয়োগ ঘটেছিল।'

২০০৬ সালে ভারত সরকার বিজ্ঞানী প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মদিন ২৯ জুনে জাতীয় পরিসংখ্যানতত্ত্ব দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

তপন চক্রবর্তী সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসক

উপাসনা গৃহ

ভ্রমণ

শান্তিনিকেতন ভ্রমণ

সে-কালের রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করে এলাম

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম

বড় আশা নিয়ে শান্তিনিকেতনকে সামনে রেখে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। পুনে, লাভাসা, গোয়া, মুম্বই এবং সর্বশেষ শান্তিনিকেতন ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এলাম। সফরসূচিতে তিন দিনের অবস্থান পরিকল্পনা নিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছই রাত ১১টায়। শিয়ালদহ থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে চড়ে রাত ১০.৩০ বোলপুর স্টেশনে অবতরণ। অতঃপর ট্যাক্সিতে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সস্ত্রীক বাঁশরী গেস্ট হাউজের মেহমান হলাম। ভ্রমণের টিকেট/ গেস্ট হাউজ বুকিং সবই আগে থেকে করে রাখা হয়েছিল।

বাঁশরী গেস্ট হাউজে থাকার বিষয়টি বিশ্বভারতীর পিআরও-র পরামর্শমতই করেছিলাম। থাকতে চেয়েছিলাম বিশ্বভারতীর গেস্ট হাউজে। শান্তিনিকেতন দেখব বিশ্বভারতীর গেস্ট হাউজে অবস্থান করে; এমন একটি সুখানুভূতি নিয়ে ওয়েব সাইট ঘেঁটে পিআরও-র সাথে ফোনে যোগাযোগ করলাম।

রামকিঙ্কর বেইজ নির্মিত রবীন্দ্র-ভাস্কর্য, শান্তিনিকেতন

ছাতিমতলা, পূর্ব দিক

দেহলী

'আমি পেশায় অবসরপ্রাপ্ত নেশায় লেখক' এমত বাক্য দিয়ে শুরু করে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। বিশ্বভারতীর গেস্ট হাউজে থাকার আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানালাম। অমায়িক ভদ্রলোক– স্বাগত জানালেন আন্তরিকতার সঙ্গে। বললেন, বাংলাদেশ থেকে অনেক খ্যাতিমান লোকেরা আসেন শান্তিনিকেতনে, থাকেন আমাদের গেস্ট হাউজে। কিন্তু আমি দুঃখিত আপনাকে এই মুহূর্তে থাকতে দিতে পারছি না। আমাদের সব গেস্ট হাউজ রিনোভেট করা হচ্ছে। আপনি যদি হাইফাই হোটেলে থাকতে না চান তবে বাঁশরী গেস্ট হাউজটি বেছে নিতে পারেন। ছিমছাম এবং প্রায় শান্তিনিকেতনের ভেতরই এর অবস্থান। আমি বিকল্প কোন চিন্তা না করেই তা বুক করে ফেললাম। বাঁশরী আমাকে হতাশ করেনি। সত্যিই ছিমছাম সহনীয় ভাড়ায় ভদ্র পরিবেশে থাকার একটি স্থান।

পরদিন প্রথমেই পিআরও-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে পেলাম না, ট্যুরে গেছেন। ডেপুটি পিআরও আমাদের স্বাগত জানালেন। নানান বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শেষে আমার চারখানা বই উপহার দিলাম শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে রাখার জন্য। সবগুলো বই আনতে পারিনি। বাকিগুলো ডাকে পাঠাব বলে তাঁকে জানালাম। শান্তিনিকেতন দেখা কীভাবে শুরু করব তাঁর মতামত চাইতেই, তিনি বিশ্বভারতীর ব্রোশিয়রসহ আমাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। আমার অদম্য ইচ্ছার কথা এবার তাঁকে জানালাম। 'ওপেন এয়ার ক্লাশ রুম' কোথায় কখন দেখতে পাব, তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি আমায় হতাশ করলেন। এখন আর ওপেন এয়ার ক্লাশ হয় না। আমার শান্তিনিকেতন আসার মূল আকর্ষণ ছিল ওপেন এয়ার ক্লাশ দেখা। শুনেছি পর্যটকেরাও ক্লাশে যোগ দিতে পারে। সেই মূল আকর্ষণই নেই। আমি বস্তুত হতাশই হলাম।

হতাশ মনকে কিছুটা চাঙ্গা করে প্রথমেই গেলাম রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্র জাদুঘর– যেটাকে কবিগুরুর জীবনকালের নানান বিষয়/ বস্তু দিয়ে সাজানো হয়েছে। নোবেল পুরস্কারের মেডেলটিও আছে। তবে আসলটি নয়। সেটিতো চুরি হয়ে গেছে বেশ ক'বছর আগেই। এখন সেটির রেপলিকাই সংরক্ষণ করা আছে। জাদুঘরের ডিসপ্লের ধরনটি আমার পছন্দ হয়নি। গাদাগাদি করে বিশ্বকবিকে যে পরিসরে সাজানো হয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে কবির বিশাল ব্যাপ্তির প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

ক্যাপশনগুলো এত ছোট করে লেখা হয়েছে যে মাথা হেট করে পড়াও দুষ্কর। আমি আমার অবজারবেশনগুলো উপস্থিত কর্মীদের জানালাম। এতবড় দালান থাকতে কবির জন্য এত ছোট্ট বরাদ্দ কেন? ক্যাপশন/ সাইটেশনগুলো আরো বড় অক্ষরে লিখে রাখলে দর্শনার্থীরা সহজে তা পড়তে/ জানতে পারবে। এখনকার যে পরিবেশ তাতে দেখা হয়, জানা হয় না। তাঁরাও একমত পোষণ করলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন, তাদের কর্মকর্তাকে

বিষয়গুলো বলে যাবার। আমি কর্মকর্তার খোঁজ করলাম। তাঁকে পেলাম না। তাই আর জানানো হল না। মন্তব্য বই চাইলাম তাও পেলাম না।

আর একরাশ দুঃখ নিয়ে কবির বাসস্থান অংশটি দেখতে গেলাম। সেগুলো দেখে ভাল লাগল। কবির বেড রুম, বৈঠকখানা, যে মাটির ঘরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেগুলো দেখে সে-যুগের কবিগুরুকে কিছুটা অনুভব করলাম। ছবি তুলতে চাইলাম, দারোয়ান বারণ করল, ছবি তুলতে মানা। আবারও হতাশ হলাম। ছবি তুললে নিরাপত্তার এমন কী হানি হবে বা স্থাপনাগুলোর এমন কী ক্ষতি হবে তা বোধগম্য হল না। এগুলো আমাদের এ উপমহাদেশীয় কুপমণ্ডুকতা বলেই আমার মনে হল। এমন কি ছাতিমতলাটিও পর্যটকের জন্য খোলা নেই। রাস্তা থেকে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এভাবে হিন্দি ভবন, চিনাভবন, কলাভবন, সংগীতভবনসহ প্রায় সব স্থাপনাই নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে বন্দী।

তবে শান্তিনিকেতনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। গাছপালায় ঘেরা গ্রামীণ পরিবেশে একটি ইউনিভার্সিটি টাউনশিপ। চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছাত্রাবাস; শিক্ষক কর্মচারীদের বাসভবন। শহরের মত গায়ে গায়ে লাগানো নয়। ভদ্র-ভব্য দূরত্ব বজায় রেখেই সবকিছুকে সাজানো হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সীমানার মধ্যে অপর নোবেল বিজয়ী অমর্ত সেনের বাড়িটিও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান রাস্তা থেকে বাড়ির পথটি একটু ভিতরে গিয়ে মূল ফটকে পৌঁছেছে। শান্তিনিকেতনের অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে মেলানোর জন্যই যেন এমনটি করা হয়েছে। বাড়ির নাম 'প্রত্যাশা'।

শান্তিনিকেতনের পাশে কবি রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি স্থাপনা শ্রীনিকেতন। মূলত কৃষিবিষয়ক পড়াশোনার জন্যই এটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ছাত্ররা ভারত তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এখানকার কৃষিবিষয়ক বিদ্যা বোলপুরবাসীর (শান্তিনিকেতন এ থানায় অবস্থিত) কোন কাজে আসছে বলে মনে হল না। কারণ আদি কৃষি ছাড়া উন্নত পদ্ধতির মাছ, মাংস, পল্ট্রি, ফল-ফলাদির কোন উৎপাদন এ অঞ্চলে হয় না। বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতনে কৃষিবিষয়ক পড়াশোনায় বোলপুরবাসীর জন্য কোন আলাদা কোটাও নেই। সারা ভারতের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই তাদের এখানে ভর্তি হতে হয়। এজন্য এখানকার বাসিন্দাদের কিছুটা অনুযোগও আছে।

বিশাল এলাকা নিয়ে শান্তি-শ্রীনিকেতনের ব্যাপ্তি– প্রায় ৫/৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা। বেশিরভাগ এখনও অব্যবহৃত। স্থানীয় দু'জন জমিদার এ বিশাল এলাকার অধিকাংশই দান করেছেন। পর্যটন ব্যবসা এখানে বেশ জমজমাট। এ ছোট্ট টাউনশিপে প্রচুর পর্যটক আসেন। তাই গড়ে উঠেছে অনেক বিলাসবহুল হোটেল-মোটেলসহ নিম্ন/ মধ্যমানের আবাসন। কলকাতা

নতুন বাড়ি

শালবীথি

শান্তিনিকেতন গৃহ

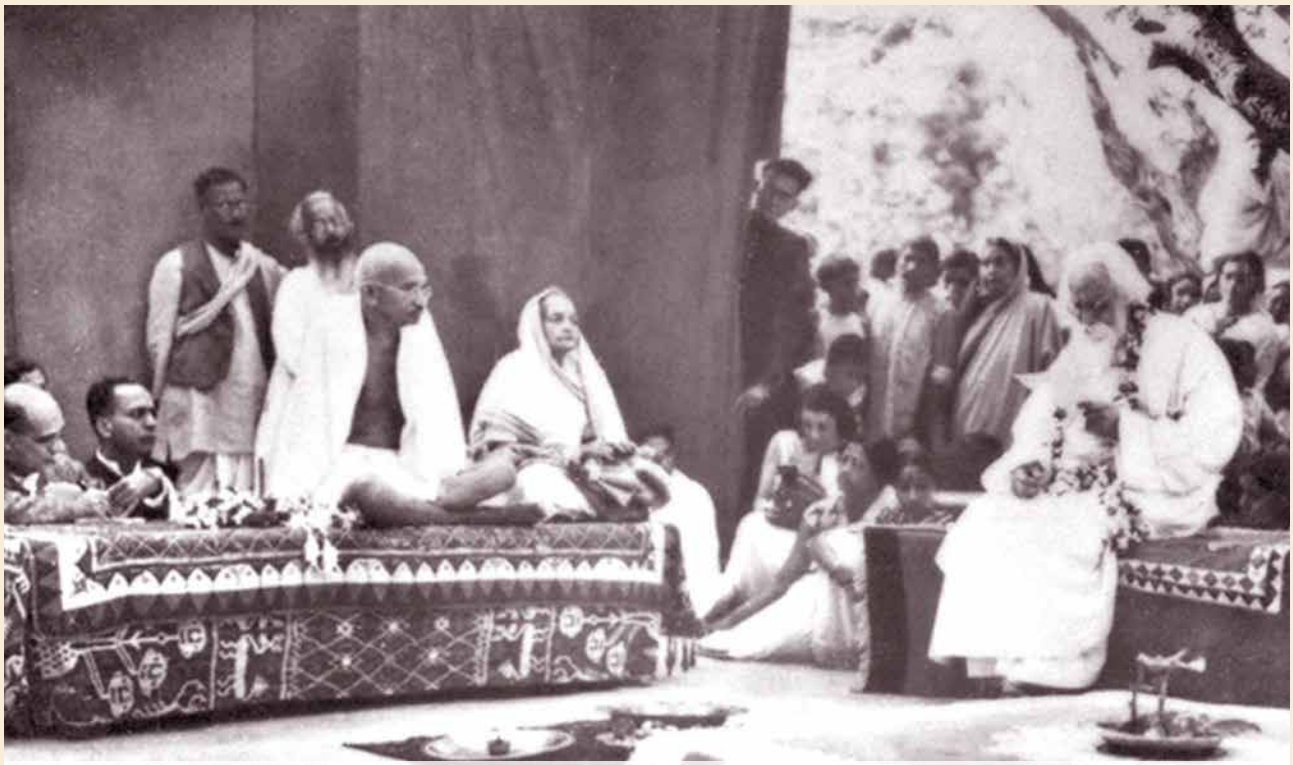

শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪০

থেকে শান্তিনিকেতনের জন্য এক্সক্লুসিভ একটি ট্রেনও আছে। নাম 'শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস'। বেলা দশটায় তা ছেড়ে সাড়ে বারটায় বোলপুরে পৌঁছয়। আবার বেলা একটায় ফিরতি যাত্রা শুরু করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে বিকেল সাড়ে তিনটায়। বাংলাদেশি ভ্রমণপিপাসুরা এ ট্রেন সার্ভিসটি ব্যবহার করতে পারেন। তেমন ভিড় নেই।

হাওড়া প্লাটফর্মে গিয়ে সহজেই টিকেট কিনে নিতে পারবেন। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব রেলপথে ১৫৩ কিমি, সড়ক পথে ২১২।

শান্তিনিকেতনের ওপেন এয়ার ক্লাশ তুলে দেওয়া হয়েছে ছাত্র-শিক্ষকদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে। আমাদের বাঁশরী হোটেলের ম্যানেজার শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তার সময়েও গাছতলায় ক্লাশ হত। তার ভাষ্যমতে এটা অনেক অসুবিধা করত। পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাত। একদল পর্যটক আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়াত। আমাদের দেখতে থাকত। নিজেদের চিড়িয়াখানার জীবজন্তু বলে মনে হত। কারো কোলে বাচ্চা, হঠাৎ কেউ করে কেঁদে উঠত; তাতে আমরাসহ শিক্ষকও বিব্রত বোধ করতেন। তাঁর কথা থেকে বোঝা গেল গাছতলার ক্লাশ কেন তুলে দেওয়া হয়েছে।

গাছতলার ক্লাশে ক্ষণিকের ছাত্র হতে না পারলেও শান্তিনিকেতন দেখে এসেছি এটাই মনের শান্তি। আর একটি কৌতুককর বিষয় উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। যে রিকসাচালক আমাদের শান্তিনিকেতন দেখিয়েছে সে হঠাৎ বলে উঠল, স্যার, আপনাকে আমি প্রথমে প্রণব মুখার্জি বলে ভুল করেছিলাম। পরক্ষণেই চিন্তা করলাম, তিনি হলে তো কত লোক লসকর গাড়ি সিকিউরিটি থাকত। কাজেই আপনি তিনি নন। যাক বাবা, ভুল করে হলেও ক্ষণিকের জন্য প্রণব মুখার্জি হওয়ার সৌভাগ্য তো হল– সে রিকসাওয়ালার চোখে হোক, তাও সই!

তালধ্বজ

সম্পূরক তথ্য

শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের নিকট অবস্থিত একটি আশ্রম ও শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে বোলপুর শহরের উত্তরাংশে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মে এই আশ্রম ও আশ্রম-সংলগ্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপস্থিতি অতি সমুজ্জ্বল। শান্তিনিকেতন চত্বরে নিজের ও অন্যান্য আশ্রমিকদের বসবাসের জন্য রবীন্দ্রনাথ অনিন্দ্য স্থাপত্যসৌকর্যমণ্ডিত একাধিক ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আশ্রমনিবাসী বিভিন্ন শিল্পী ও ভাস্করের সৃষ্টিকর্মে সজ্জিত হয়ে এই আশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থল হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম
ভ্রামণিক

এক নজরে কেরালা	
দেশ	ভারত
রাজধানী জেলা	তিরুবনন্তপুরম ১৪টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৫৬
সরকার • গভর্নর • মুখ্যমন্ত্রী • মুখ্যসচিব • বিধানসভা	 পি শতশিবম পিনারাই বিজয়ন (সিপিআই এম) পল এন্টনি এককক্ষ বিশিষ্ট (১৪১ আসন)
ক্ষেত্রফল • মোট • এলাকা ক্রম	 ৩৮,৮৬৩ বর্গকিমি (১৫,০০৫ বর্গমাইল) ২২তম
জনসংখ্যা • মোট • ক্রম • ঘনত্ব	 ৩,৩৩,৮৭,৬৭৭ ১৩তম ৮৬০/বর্গকিমি (২২০০/বর্গমাইল)
জাতীয়তা	কেরালাইট, কেরালান ও মালয়ালি
সরকারি ভাষা	মালয়ালম, ইংরেজি
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
ISO 3166 code	IN-KL
ওয়েবসাইট	www.kerala.gov.in

পি শতশিবম
গভর্নর

পিনারাই বিজয়ন
মুখ্যমন্ত্রী

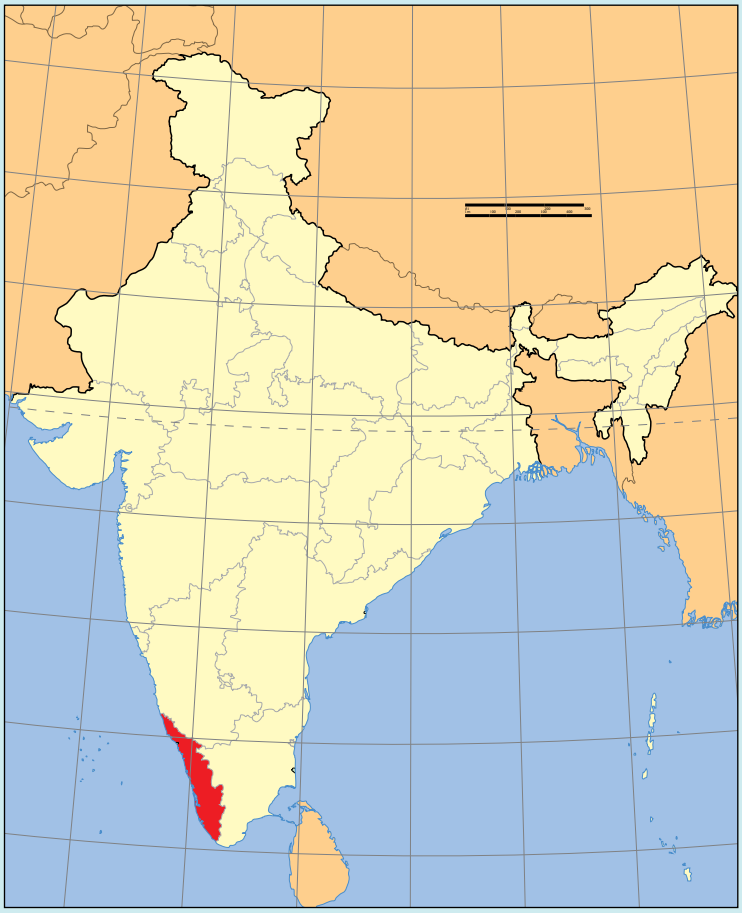

রাজ্য পরিচিতি

কেরালা

কেরালা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য। এটি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য– দেশের মোট ক্ষেত্রফলের মাত্র ১ শতাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত। মালাবার উপকূল বরাবর কেরালা দৈর্ঘ্যে ৩৬০ মাইল (৫৮০ কিলোমিটার) এবং প্রস্থে মোটামুটি ২০ থেকে ৭৫ মাইল (৩০ থেকে ১২০ কিমি)। এর উত্তরে কর্নাটক (সাবেক মহীশূর), পুবে তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর। এটি উত্তর-পশ্চিম উপকূলে পণ্ডিচেরি রাজ্যের মাহে নামে একটি অংশ দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এর রাজধানী তিরুবনন্তপুরম (ত্রিবান্দ্রাম)। পশ্চিমঘাটের পর্বতমালার কারণে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হলেও এর দীর্ঘ উপকূলের কারণে অনেক বেশি বিদেশী প্রভাবমুক্ত। পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় ঐতিহ্য ছাড়াও নিজস্ব মালয়ালম ভাষার কারণে উপমহাদেশে কেরালায় এক অনন্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কেরালার মেয়েদের কারণে এর সামাজিক মর্যাদাও যথেষ্ট উপরে– এই শক্তির মূলে আছে এর প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

পেরিয়ার জঙ্গলে হাতির দঙ্গল

নীলগিরি তহ্‌র

ক্ষেত্রফল ১৫ হাজার ৫ বর্গমাইল (৩৮ হাজার ৮ শো ৬৩ বর্গ কিমি)। জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৩ কোটি ২২ লাখ ৮৭ হাজার ৬ শো ৭৭।

ভূমিরূপ

কেরালা হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আনাই শৃঙ্গ (৮ হাজার ৮ শো ৪২ ফুট বা ২ হাজার ৬ শো ৯৫ মিটার) হচ্ছে উপদ্বীপ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, পশ্চিমঘাটের মাথার মুকুট। পাবর্ত্য উচ্চভূমি থেকে পশ্চিম দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে উপকূলীয় সমভূমিতে মিশেছে, তাই বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ধরনের শস্যের আবাদ হয়। উপকূল বরাবর অনেকানেক লেগুন ও ব্যাক ওয়াটার-এর মালা কেরালাকে ভারতের তথাকথিত ভেনিসে পরিণত করেছে। পোন্নাই (ভারতপূজা), পেরিয়ার, টালকুড়ি ও পামবার মত অধিক গুরুত্বপূর্ণ নদী আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে।

জলবায়ু

কেরালার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে সামান্যই পরিবর্তিত হয়। সারা বছরের গড় তাপমাত্রা ৭০° থেকে ৮০° ডিগ্রি ফারেনহাইট (২৭° থেকে ৩২° সেলসিয়াস)। রাজ্যে সরাসরি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়– যা চলে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অবধি, কিন্তু বিপরীতমুখী (উত্তর-পূর্ব) মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়, যা স্থায়ী হয় অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। রাজ্যের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১১৫ ইঞ্চি (৩ হাজার মিমি), কোন কোন ঢালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ ইঞ্চি (৫ হাজার মিমি)-রও বেশি।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল

কেরালার জলবেষ্টিত উপকূলীয় এলাকা নারকেলবীথি সমাকীর্ণ। তবে পশ্চিমঘাটের অনেক এলাকা এবং নদীবিধৌত ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী (গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পত্রমোচী) বনাঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উচ্চভূমি প্রায়শ ঢেউ খেলানো তৃণভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। এই বিপরীতমুখী পরিবেশ কেরালাকে বৈচিত্র্যময় প্রাণিকুলের আবাসভূমিতে পরিণত করেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলের মধ্যে সম্বর হরিণ, গাউর (বুনো গরু), নীলগিরি তর (বুনো ছাগলজাতীয় প্রাণি), Hemitragus hylocrius বা এর প্রজাতি যেমন Nilgiritragus hylocrius, হাতি, চিতা, বাঘ, বনেট বানর (bonnet monkeys) বিরল সিংহ-লেজওয়ালা macaques (Macaca Silenus) ও হনুমান এবং নীলগিরি লেঙ্গুর (যথাক্রমে Semnopithecus entellus ও trachypithecus johnii। উল্লেখযোগ্য সরীসৃপের মধ্যে আছে কিং কোবরা (কাল কেউটে), পক্ষীকুলের মধ্যে ময়ূর ও হর্নবিল আছেই। রাজ্যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান ও বণ্যপ্রাণি সংরক্ষণশালা রয়েছে যার মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান ও ব্যাঘ্র সংরক্ষণশালা।

জনসংখ্যা

মিশ্র জাতিগত ঐতিহ্যের মালয়ালি জনগণ দ্রাবিড়ি ভাষা মালয়ালমে কথা বলে– এরাই কেরালার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। অধিকাংশ মালয়ালিই ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা তথাকথিত দ্রাবিড়ীদের উত্তরপুরুষ যারা ২০০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে উপমহাদেশে আর্যদের (ইন্দো-আর্য ভাষী) উত্তরপুরুষদের আক্রমণে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর হাজার বছরে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক মিশ্রণ ঘটেছে। গোঁড়া হিন্দুদের কটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ নামবুদ্রীরা হচ্ছে ইন্দো-আর্য উত্তরসূরী। কেরালায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তামিলও বসবাস করে, এরা হচ্ছে দ্রাবিড়ী উত্তরসূরীদের নিকট-প্রতিবেশী।

কেরালার অর্ধেকের বেশি মানুষ যাদের অধিকাংশই মালয়ালি, হিন্দুধর্মের অনুসারী। জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মালাবার উপকূল বরাবর মোপলা (মোপিল্লা)-রা রাজ্যের বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়। জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ খ্রিস্টান– এরা গোঁড়া সিরীয় ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী, আছে বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীও। কেরালায় অল্প কিছু জৈন, শিখ, বৌদ্ধ ও ইহুদী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে; কোচিতে আছে প্রাচীন সিনগতা

ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার জাল

ঐতিহ্যবাহী হাউসবোট

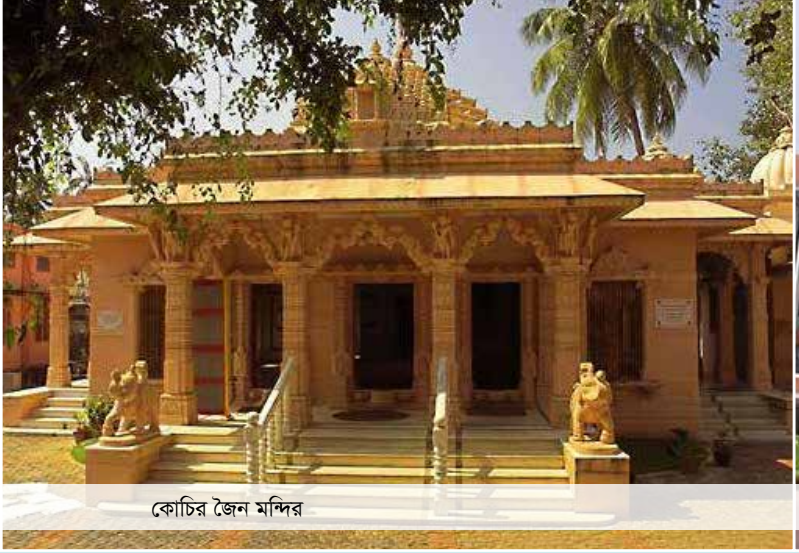

কোচির জৈন মন্দির

তিরুবনন্তপুরমে বিধানসভা ভবন

সম্প্রদায়ের মানুষ।

বসতির ধরন ও জনমিতির ধারা

কেরালা ভারতের অন্যতম জনবহুল রাজ্য। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ শহরে বাস করত। এ ধরনের পরিসংখ্যান ভ্রান্তিজনক কারণ উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রামের বসতি অতিশয় ঘন। কোন কোন গ্রামের বসতি শহরের অনুরূপ। কোচি, তিরুবনন্তপুরম, কোজিকোড়ে, কোল্লাম (কুইলন), আলাপ্পুজা (আল্লেপ্পি), ত্রিসূর (ত্রিচুর) ও থালাসেরি (তেলিচেরি) হচ্ছে প্রধান শহর ও শিল্প এলাকা।

অর্থনীতি ॥ কৃষি, বন ও মৎস্য

কৃষি হচ্ছে কেরালার প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। কৃষির আওতায় অর্ধেকের চেয়ে কম জমিতে করা বাণিজ্যিক চাষাবাদ বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ আনে বটে তবু স্থানীয় চাহিদা মেটাতে খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হয়। কেরালার প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে রবার, কফি ও চা যা পাহাড়ের ঢালে রোপণ করে চাষ করা হয়, আরও আছে সুপারি, এলাচ, কাজু বাদাম, নারকেল, আদা ও গোলমরিচ। প্রধান খাদ্য শস্যের মধ্যে আছে ধান, ডাল (যেমন: মটরদানা ও সিম বিচি), জোয়ার ও টেপিওকা। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ফার্মও যথেষ্ট বেড়েছে।

বন থেকে মূল্যবান কাষ্ঠসম্পদ যেমন আবলুস, রোজউড ও সেগুন কাঠ আহরণ করা হয়। এছাড়া কেরালায় বনরাজি থেকে বহু শিল্প-কাঁচামাল যেমন বাঁশ (কাগজ ও রেয়ন শিল্পে ব্যবহৃত), কাঠের মণ্ড, কয়লা, আঠা ও রজন পাওয়া যায়। কেরালা মৎস্য উৎপাদনেও নেতৃ স্থানীয়। সার্ডিন, টুনা, ম্যাকারেল ও চিংড়ি হচ্ছে মৎস্যশিল্পের প্রধান উৎপাদন।

সম্পদ ও বিদ্যুৎ

কেরালায় জীবাশ্ম জ্বালানির ভাণ্ডার তেমন নেই। তবু ইলমেনাইট (টিটানিয়ামের প্রধান আকরিক), রুটাইল (টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড) ও মোনাজাইট (সেরিয়াম ও থোরিয়াম ফসফেট মিশ্রিত খনিজ)-এর একটা মাঝারি আকারের মজুত আছে, যার সবই পাওয়া যায় উপকূলের বালুকারাশিতে। অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে আছে চুনাপাথর, লৌহ আকরিক ও বক্সাইট (এলুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক)। কেরালা এর উচ্চমানের কাওলিন (চিনামাটি)-এর জন্য বিখ্যাত, যা তৈজসপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কেরালার জলবিদ্যুৎ শক্তি যথেষ্ট। প্রায় দু'ডজন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সারা রাজ্যে সচল রয়েছে। বিভিন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রও অতিরিক্ত বিদ্যুতের যোগান দেয়। গত শতকের শেষপাদে রাজ্যে বায়ুকলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়া নানা পুনর্বায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হলেও কেরালাকে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়।

উৎপাদন, সেবা ও শ্রম

কৃষির পাশাপাশি উৎপাদন ও সেবা কর্মকাণ্ড কেরালার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প যেমন তাঁত, নারকেল ছোবড়ার নানা পণ্য, কাজু প্রক্রিয়াজাতকরণের মত উৎপাদনশীল খাত অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প একটি প্রধান কর্মসংস্থান খাত। অন্যান্য প্রধান উৎপাদনশীল পণ্যের মধ্যে আছে সার, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, টিটানিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাইউড, সিরামিক ও কৃত্রিম ফেব্রিকস। ব্যাংকিং, ফিন্যান্স ও সেবাখাতের অন্যান্য উপাদান রাজ্যের কর্মশক্তির একটা বড় অংশ দখল করে আছে। তা সত্ত্বেও বেকারি প্রকট, বহু উচ্চ শিক্ষিত যুবক উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হতে পারছে না।

পরিবহন

কেরালা সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থায় খুবই উন্নত। জাতীয় মহাসড়কের মাধ্যমে এর সঙ্গে তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের যোগাযোগ রয়েছে। পুব থেকে একটা রেলপথ পশ্চিমঘাটের পালঘাট গ্যাপ হয়ে রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত রেলপথের সঙ্গে মিশেছে। এর গন্তব্য ভারতের সর্বদক্ষিণের শহর কন্যাকুমারী। কোচিতে একটি প্রধান বন্দর রয়েছে, আরো ৩টি মধ্যম

কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

কোল্লাম শহর

রাতের কোচি

ঐতিহ্যবাহী কথাকলি নৃত্য

পর্যায়ের বন্দর রয়েছে কোজিকোড়ে, আলাপ্পুজা ও নিনদাকারায় (তিরুবনন্তপুরমের নিকটবর্তী); সব বন্দরই উপকূলীয় ও বিদেশী জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করে। কোচিতে একটি বড় শিপইয়ার্ড এবং তৈল শোধনাগার রয়েছে, রয়েছে ভারতীয় উপকূলীয় রক্ষী বাহিনির জেলা সদর দফতর এবং ভারতীয় নৌ বাহিনির একটি আঞ্চলিক সদর দফতর। বন্দর থেকে পণ্য পরিবহনের জন্য রয়েছে ১ হাজার মাইল (১৬০০ কিমি)-এর বেশি জলপথ। তিরুবনন্তপুরম, কোজিকোড়ে ও কোচিতে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে।

সরকার ও সমাজ

১৯৫০ সালের জাতীয় সাংবিধানিক কাঠামো অনুসারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত কেরালাও সরকার কাঠামোভুক্ত। রাষ্ট্রপতির নিযুক্ত গভর্নর রাজ্যের প্রধান। তাঁকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ। রাজ্যে একটি নির্বাচিত এক কক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা রয়েছে। এরনাকুলামে অবস্থিত হাইকোর্টের নেতৃত্ব দেন প্রধান বিচারপতি। হাইকোর্টের আপিলসমূহ যায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে। হাইকোর্টের নিচে আছে জেলা কোর্ট, মহকুমা কোর্ট, মুন্সেফ কোর্ট এবং মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। এছাড়াও বিশেষ ধরনের ক্ষমতা সামলাতে আছে পারিবারিক ও অন্যান্য বিশেষ আদালত। স্থানীয় পর্যায়ে কেরালা কয়েকটি জেলায় বিভক্ত, যা আবার রাজস্ব আদায়ের জন্য তালুক (মহকুমা) ও গ্রামে বিভক্ত।

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ

কেরালার স্বাস্থ্যসেবার মান খুবই উন্নত। একাধিক পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য আছে সম্প্রসারিত বিমা পরিকল্পনা। এছাড়া অনেক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিস্‌পেনসারিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু আছে। পরিবার পরিকল্পনা, অন্ধত্ব নিবারণ এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি নিরাময়ে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা প্রদান হচ্ছে সরকারের স্বাস্থ্য স্কিমের প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষা

কেরালা ভারতের অন্যতম অগ্রসর শিক্ষাব্যবস্থা এবং সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার বিশিষ্ট রাজ্য। ৬ থেকে ১১ বছরের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পলিটেকনিক, শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কলা ও বিজ্ঞান কলেজ ও পেশাভিত্তিক নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭)-সহ অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া কোজিকোড়েতে ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৭১ সালে কোচিতে প্রতিষ্ঠিত হয় কোচিন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং ত্রিচুরে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কেরালা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

সাংস্কৃতিক জীবন

কেরালার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাপক সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তামার পাতে আচ্ছাদিত প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের সারির সঙ্গে আছে মালাবার গ্যাবলস্‌ মসজিদ (তিনকোণা গম্বুজবিশিষ্ট) ও পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক যুগের বারোক গির্জা। এসব মন্দির-মসজিদ-গির্জার স্থাপত্যশৈলীতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের কালপঞ্জির স্বাক্ষর রয়েছে। কেরালার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিল্পকর্মের মধ্যে আছে দারুশিল্প, ম্যুরাল ও ঘরে-বাইরে সর্বত্র লক্ষণীয় বাতিদান। এ কারণে কেরালাকে 'ল্যান্ড অফ ল্যাম্পস্‌' বলা হয়।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে কেরালায় তামিল ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় সাহিত্য পঠনপাঠন বিকাশ লাভ করে। এদিকে তামিলের আত্মজ মালয়ালম ভাষা সংস্কৃত থেকে পুষ্টি নিয়ে বিকশিত হতে থাকে এবং সৃজনশীল সাহিত্যভাষা হয়ে ওঠে। মালয়ালম কবিতার উল্লেখযোগ্য চিরায়ত কবিরা হলেন তুনচাট্টু ইলুট্টাকন ও কুলচান নামপিয়ার। বিংশ শতাব্দীর কবি হলেন কুমারণ আসান ও বল্লঠোল। ১৮৮৯ সালে চান্দু মেনন *ইন্দুলেখা* নামে মালয়ালম ভাষার প্রথম বিশিষ্ট উপন্যাস রচনা করেন, যার জন্যে তিনি রানি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে মৃত্যুর আগে শতাধিক উপন্যাসের জনক থাকাজি শিবশংকর

লাইট হাউস

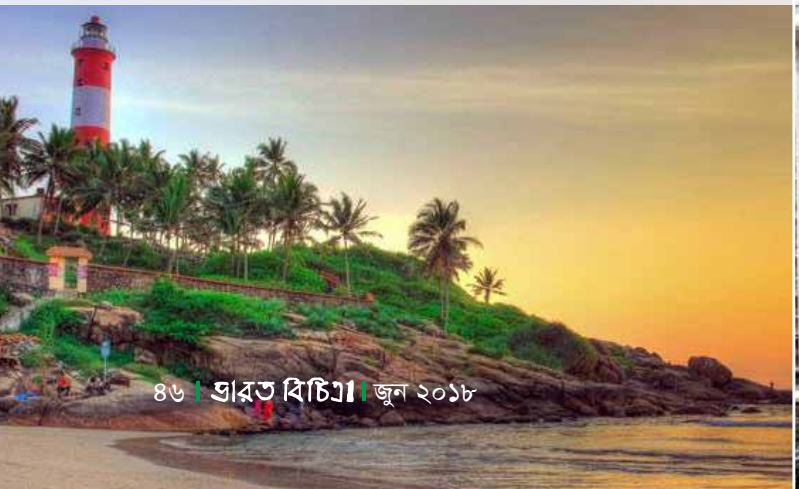

কোচিতে অবস্থিত কেরালা হাই কোর্ট

তিরুবনন্তপুরম কেন্দ্রীয় রেলস্টেশনের প্রধান প্রবেশদ্বার

তিরুবনন্তপুরমের কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়

পিল্লাই মালয়ালাই সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত ঔপন্যাসিক।

ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এবং হিন্দু দেব-দেবীদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য কেরালার আছে সমৃদ্ধ নৃত্য ঐতিহ্য। কেরালার চিরায়ত নৃত্যনাট্য কথাকলিতে পুরুষ পারফরমাররাই নারী-পুরুষ উভয় চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। এর বিপরীতে তামিলযুগের প্রাথমিককালের 'ভরতনাট্যম' আবার শুধুমাত্র নারী শিল্পীদেরই অনুশীলিত নৃত্যকলা।

ইতিহাস

আজ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর আগে মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে প্রথম কেরালা (কেরালাপুত্রা)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব শেষ শতকে গ্রিক ও রোমানদের কাছে অঞ্চলটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে এর মসলা বিশেষত গোলমরিচের জন্য। খ্রিস্টীয় প্রথম ৫টি শতাব্দী এটি ছিল তামিল অঞ্চল, নাম ছিল তামিলাকম। এ সময়কালে এটি পাণ্ডিয়া, চোল ও চেরা রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। প্রথম শতাব্দীতে এখানে ইহুদি অভিবাসীদের আগমন ঘটে এবং সিরীয় গোঁড়া খ্রিস্টানদের মতে, সেন্ট টমাস দ্য অপোস্টল একই শতাব্দীতে কেরালা সফর করেন।

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শতাব্দীকাল পর্যন্ত কেরালার ইতিহাস ধূসর। তবে এ শতাব্দীর শেষপাদে আরব ব্যবসায়ীরা এখানে ইসলামের প্রবর্তন করে। কুলশেখর রাজবংশ (খ্রিস্টীয় ৮০০-১১০২)-এর শাসনামলে একটা বিশিষ্ট ভাষা হিসেবে মালয়ালমের উত্থান ঘটে এবং হিন্দুত্ববাদ প্রাধান্য লাভ করে।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীকালে কেরালা প্রায়শই চোলরাজাদের দ্বারা শাসিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায় বেনাদ রাজ্যের রবি বর্মা কুলশেখর দক্ষিণ ভারতে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রধান্য বিস্তার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেরালা যুধ্যমান সেনাপতিদের চারণভূমিতে পরিণত হয়– উত্তরে কালিকট (বর্তমানে কোজিকোড) এবং দক্ষিণ বেনাদদের আধিপত্য চলতে থাকে।

ভাস্কো ডা গামার কালিকটে অবতরণের পর কেরালায় ১৪৯৮ সাল থেকে বিদেশী হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা আরব বণিকদের তাড়িয়ে মালাবার উপকূলে তাদের ব্যবসায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কালিকটের জামোরিন (উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাবান শাসক) প্রতিহত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচরা পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে বেনাদের সিংহাসনে বসেন মার্তণ্ড বর্মা এবং ১২ বছর পরে কোলাচেলের যুদ্ধে ডাচদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। তারপর মার্তণ্ড বর্মা ইউরোপীয় ধারার সৈনিক-শৃঙ্খলা গ্রহণ করে চারপাশের এলাকার প্রভুত্ব বিস্তার করেন যা কিনা দক্ষিণাঞ্চলীয় ত্রাবাঙ্কুর রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৫৭ সালে জামোরিনের বিরুদ্ধে তিনি মধ্যাঞ্চলীয় কোচিনরাজের সহযোগিতায় কোচিনের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। তবে ১৮০৬ সালের মধ্যে কোচিন, ত্রাবাঙ্কুর ও উত্তরের মালাবার উপকূল ব্রিটিশ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীনস্থ একটি রাজ্যে পরিণত হয়।

পরে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ দু'বছর পর কোচিন ও ত্রাবাঙ্কুর একত্রিত হয়ে 'ত্রাবাঙ্কুর-কোচিন' রাজ্য নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান কেরালা রাজ্য ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হয়।

এসময় মালাবার উপকূল ও দক্ষিণের কানারার কাসারগড় তালুক (প্রশাসনিক মহকুমা) ত্রাবাঙ্কুর-কোচিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সাবেক ত্রাবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের দক্ষিণাংশ তামিলনাড়ুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

সূত্র এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা
লেখক উইলিয়াম এ নোবল

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

কেরালার চিরচেনা নৈসর্গিক দৃশ্য

কেরালার সর্ববৃহৎ ভেম্বনদ হ্রদ

সাগরময় ঘোষ

প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক

দেশিকোত্তম সম্মান প্রাপ্তির পর বুধসন্ধ্যার সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন সমরেশ বসু ॥ চেয়ারে উপবিষ্ট সাগরময় ঘোষ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় সাময়িকী সাপ্তাহিক *দেশ*-এর প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষ জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের চাঁদপুরের এক বর্ধিষ্ণু ঘোষ পরিবারে। তাঁর পিতা কালীমোহন ঘোষ ছিলেন কর্মিষ্ঠ মানুষ– রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর। সেই সুবাদে কৈশোরেই পরিবারের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পা রাখেন সাগরময়। শান্তিনিকেতনের উদার আবহাওয়ায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় ক্রমে সংগীতে-সাহিত্যে ভালবাসা জন্ম নেয়। অগ্রজ শান্তিদেব রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক ও শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। সাগরময়ের ছিল দরাজ গলা। শান্তিনিকেতনের শিল্পসুষমা তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে জীবনভর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের টালমাটাল দিনে সাগরময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজরোষে নিপতিত হন– ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*র সম্পাদক অশোককুমার সরকারের সঙ্গে। অশোককুমার তাঁকে *আনন্দবাজারে* যোগ দিতে বলেন। জেলফেরত সাগরময় সহকারী সম্পাদক হিসেবে *দেশ* পত্রিকায় যোগ দিলেন কিন্তু মনে খুঁতখুঁতানি ছিলই– ভেবেছিলেন পত্রিকার চাকরি তাঁর গান আর আড্ডার সময় কেড়ে নেবে। বন্ধুদের সেই উন্মাতাল আড্ডায় কী না চর্চিত হত! সাহিত্য থেকে ফুটবল, রাজনীতি থেকে চলচ্চিত্র কোন প্রসঙ্গই বাদ যেত না।

১৯৩৯ সালে তিনি *দেশ* পত্রিকায় যোগ দেন। অশোককুমার সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি পত্রিকাটি আমূল বদলে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে– তাঁর কাছ থেকে একটি কবিতা ও 'শেষ কথা' নামে একটি গল্প এনে *দেশ*-এ ছাপলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান সব লেখকদের এনে জড় করলেন *দেশ*-এর ছত্রছায়ায়।

সম্পাদকের কাজ তো শুধু কীর্তিমানদের রচনা পত্রস্থ করা নয়, তিনি নতুন লেখক সৃষ্টিতে মনোযোগ দিলেন। ঝুঁকি নিয়ে শংকরের লেখা ছাপলেন; সমরেশ বসুকে শুধু লেখা ছাপা নয়, চাকরিও দিতে চাইলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে উপন্যাস লেখালেন– এঁরা তখন মূলত কবিতাই লিখতেন। লেখার সুযোগ করে দিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, আবুল বাশার, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জয় গোস্বামী, হর্ষ দত্তদের। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের প্রায় সবাই সাগরময় ঘোষের আবিষ্কার। সাগরের (পড়ুন সাগরময়ের) অকৃপণ সেই জল (পড়ুন স্নেহ)-রাশি বাংলার সাহিত্যভিতকে সবসময় সঞ্জীবিত করেছে। তাঁর জীবৎকালে *দেশ* সাফল্যের শিখরস্পর্শ করে।

শুধু লেখক সৃষ্টি নয়, লেখকদের দুর্দিনে তাঁদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন তিনি নির্ভীকচিত্তে। অশ্লীলতার দায়ে *প্রজাপতি* নিষিদ্ধ হলে সমরেশ বসুকে সাহস জুগিয়েছেন, আর্থিক সাহায্য করেছেন। নীরদ সি. চৌধুরীর প্রবন্ধে 'তথাকথিত বাংলাদেশ' উল্লেখিত হওয়ায় বাংলাদেশে সাময়িকভাবে *দেশ* নিষিদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন অবিচলিত এবং লেখকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

চমৎকার লেখনীশক্তি ছিল সাগরময়ের। *সম্পাদকের বৈঠকে, পরম পূজনীয়, দণ্ডকারণ্যের বাঘ, একটি পেরেকের কাহিনী, হীরের নাকছাবি*-তে তাঁর হীরকদ্যুতি পাঠককে চমকিত করে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লিখতে উৎসাহী ছিলেন না– বরং লেখকদের নতুন নতুন রচনাপাঠেই তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল।

১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই গুণী সম্পাদককে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাগরময় সাহিত্যজগতের বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডায় সময় অতিবাহিত করেছেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখক-কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ

*ভারত বিচিত্রা*র সকল কবি-লেখক-প্রদায়ক-অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, আপনাদের পাঠানো যাবতীয় রচনার সঙ্গে পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইলসহ ব্যাংক একাউন্টের নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। এখন থেকে আপনাদের নামে ভারতীয় হাই কমিশনের কোন চেক ইস্যু করা হবে না। আপনাদের সম্মানী সরাসরি আপনাদের ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। কাজেই উল্লেখিত তথ্য নির্ভুল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। এতদ্‌সংক্রান্ত ভুলের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না।

– সম্পাদক, *ভারত বিচিত্রা*

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা

০৪ মে ২০১৮
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি) আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় সেলিনা আজাদ-এর আধুনিক বাংলা গান পরিবেশনা

০৫ মে ২০১৮ ছায়ানটে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি) আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় শ্রী বিজনচন্দ্র মিস্ত্রীর উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনা

১২ মে ২০১৮ ছায়ানটে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি) আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় সাদী মোহাম্মদের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনা

১২ মে ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি) আয়োজিত আবৃত্তিসন্ধ্যায় ছায়া কর্মকারের রবীন্দ্রসংগীত ও শিহাব শাহরিয়ারের আবৃত্তি পরিবেশনা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra June 2018

বারিধারার কূটনৈতিক জোনে ভারতীয় হাই কমিশনে নবনির্মিত চ্যান্সেরি ভবন

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka